সমাজ ব্যবস্থা
Social system

ইউনিট ১০

সমাজ একটি বিমূর্ত প্রত্যয়। সমাজ হচ্ছে সংঘবদ্ধ জনসমষ্টি। একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যখন বহু ব্যক্তি সংঘবদ্ধ হয়ে বসবাস করে তখন তাকে সমাজ বলে। বিভিন্ন দল বা গোষ্ঠী, প্রথা-প্রতিষ্ঠান, সামাজিক সম্পর্ক, রীতি-নীতি, মূল্যবোধ ইত্যাদির মাধ্যমে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠে। সমাজ ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। সমাজ ব্যবস্থাই সামাজিক কাঠামো নির্ধারণ করে। বস্তুত সমাজ সক্রিয় থাকে এর বিভিন্ন প্রথা-প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থার মাধ্যমে। সামাজিক, অর্থনৈতিক কিংবা রাজনৈতিক প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সামাজিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই সমাজ সক্রিয় এবং গতিশীল থাকে। বিভিন্ন ব্যবস্থার মাধ্যমেই সমাজের অস্তিত্ব প্রকাশ পায়। তাই সমাজবিজ্ঞানে সামাজিক ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ সামাজিক ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। মূলত সমাজে বিদ্যমান সব ধরনের প্রতিষ্ঠানই সামাজিক ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেরই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সমাজে এগুলোর ভূমিকা এবং কার্যক্রমও স্বতন্ত্র। সমাজস্থ মানুষ এসব প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত। প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকার মাধ্যমেই মানুষ সামাজিক সুবিধা পেয়ে থাকে। এই ইউনিটে সমাজ ব্যবস্থার অন্তর্গত বিভিন্ন ধরনের সামাজিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১৩ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ১০.১: সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা
পাঠ ১০.২: সম্পত্তি
পাঠ ১০.৩: সম্পত্তির বিবর্তন
পাঠ ১০.৪: শিক্ষা
পাঠ ১০.৫: শিক্ষার শ্রেণি বিভাগ ও ভূমিকা
পাঠ ১০.৬: শিক্ষা মতবাদ
পাঠ ১০.৭: ধর্ম
পাঠ ১০.৮: ধর্মের উৎপত্তি
পাঠ ১০.৯: নৈতিকতা
পাঠ ১০.১০: রাষ্ট্র
পাঠ ১০.১১: রাষ্ট্রের উৎপত্তি
পাঠ ১০.১২: ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব
পাঠ ১০.১৩: কর্তৃত্বের ধরন, উপাদান ও প্রভাব

পাঠ-১০.১ সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা
Economic system of society

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গুরুত্ব ব্যাখা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, উৎপাদন, ভোগ, বণ্টন ইত্যাদি।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কী (What is economic system)

মানবজীবন ও সমাজের সাথে অর্থনীতির সম্পর্ক আজন্ম এবং শাশ্বত। জীবিকার তাগিদে মানুষ যখন বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত, ফলমূল সংগ্রহ কিংবা পশু ও মৎস্য শিকার করে খাদ্যাভাব পূরণ করত, সে সময় থেকেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সূচনা। মৌলিক অর্থে অর্থনীতির গোড়াপত্তন হয়েছে আজ হতে প্রায় দশ হাজার বছর পূর্বে। খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সূচনা হয়েছিল। এ সময় ব্যক্তিগত মালিকানারও সূচনা হয়, যা অর্থনীতিকে দ্রুত শক্তিশালী করে তোলে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলতে মূলত উৎপাদন ব্যবস্থা, ভোগ, বণ্টন তথা এগুলোর সাথে সম্পর্কিত অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়। এক্ষেত্রে সম্পত্তি, সম্পত্তির মালিকানা ইত্যাদি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

সাধারণত মানুষ তার প্রয়োজন ও অভাব পরিপূরণের জন্য উপযোগ সমৃদ্ধ পণ্যের উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের যে ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে তাই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (Economic system)। Dalton-এর মতে, "অর্থনীতি হচ্ছে কিছু প্রতিষ্ঠিত কার্যক্রম, যা প্রাকৃতিক সম্পদ, মানুষের শ্রম এবং প্রযুক্তির সংমিশ্রণে পণ্য অর্জন, উৎপাদন এবং বণ্টন করে।" (An economy is a set of institutionalized activities which combine natural resources, human labour and technology to acquire, produce and distribute goods...)।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটি নির্দিষ্ট স্থানে থেমে থাকেনি। মানুষ সর্বদা নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট থাকে। তাই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও বিবর্তিত হয়ে উন্নতি লাভ করেছে। মানুষের মেধা, মনন, সভ্যতা যেমন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সমৃদ্ধ করেছে, তেমনি অর্থনীতিও মানুষের সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছে।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গুরুত্ব (Importance of economic system)

আদিম সমাজে সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না। কিন্তু মানুষের জীবন-জীবিকা ছিল। মানব জীবনের এ স্তরে শিকার এবং খাদ্য সংগ্রহভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিরাজমান ছিল। পর্যায়ক্রমে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশ এবং সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। মানব জীবন, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গুরুত্ব ও প্রভাব অনেকখানি। এখানে সমাজে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গুরুত্ব তুলে ধরা হলো:

১) জীবিকার উৎস: যেকোনো সময়, সমাজ ও স্থানে জীবিকার উৎস হচ্ছে এর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই মানুষের জীবিকা নির্ধারিত হয়। কৃষি কিংবা শিল্প, সামন্ত কিংবা পুঁজিবাদ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যা-ই হোক না কেন তা মানুষের জীবিকার উৎস হিসেবে কাজ করে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কেউ শ্রমজীবী আবার কেউ মালিক হিসেবে ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু সবার প্রধান লক্ষ্য থাকে সেখান থেকে জীবিকা নির্বাহ করা।

২) সভ্যতা বিকাশের হাতিয়ার: অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সভ্যতা বিকাশের প্রধান হাতিয়ার। কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সভ্যতার সূচনা ও বিকাশে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছে। কৃষিতে উদ্বৃত্ত উৎপাদন ব্যবস্থাই শিল্পভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সভ্যতার আরো উৎকর্ষ দান করেছে। রাষ্ট্র কাঠামো, মানবিক ও সামাজিক মূল্যবোধ, জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নতি সাধনে সমৃদ্ধিশালী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

৩) **সামাজিক অসমতা ও স্তরবিন্যাসের অন্যতম নিয়ামকঃ** অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রধান স্তম্ভ হচ্ছে সম্পত্তির মালিকানা। সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানা সামাজিক অসমতা ও স্তরবিন্যাস সৃষ্টি করেছে। সমাজে উঁচু-নিচু ভেদাভেদ, অসমতা ও স্তরবিন্যাসের মূলে মালিকানা এবং উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যক্তির ভূমিকা বিশেষভাবে কাজ করে। সম্পত্তিতে যখন ব্যক্তিগত মালিকানা এবং শ্রমবিভাজন ছিল না তখন সমাজও ছিল সমতাভিত্তিক। সুতরাং সামাজিক অসমতা ও স্তরবিন্যাসের মূলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভূমিকা অন্যতম।

৪) **সামাজিক শ্রেণি কাঠামো নির্ধারণ করেঃ** অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সমাজের শ্রেণি কাঠামো নির্ধারণ করে। সম্পদের মালিকানা, উৎপাদন ব্যবস্থায় ভূমিকা ও শ্রমবিভাজন সমাজে বিভিন্ন শ্রেণির বিকাশ ঘটায়। সরল অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সামাজিক শ্রেণি ও পেশাজীবীর সংখ্যা খুব সীমিত। কিন্তু অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিকাশের মাধ্যমে সমাজে নানা পেশাজীবী শ্রেণির আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। ভূমিমালিক-ভূমিহীন, মালিক-শ্রমিক, বিত্তশালী-বিত্তহীন, ধনী-দরিদ্র, উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত-বিত্তহীন ইত্যাদি শ্রেণির মূলে রয়েছে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।

৫) ক্ষমতা কাঠামোর প্রধান শক্তিঃ ক্ষমতা কাঠামোর প্রধান শক্তি বা উপাদান হচ্ছে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। সম্পত্তির মালিকানা, উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্ক ইত্যাদি ক্ষমতা কাঠামো নির্ধারণে ভূমিকা রাখে। গ্রামীণ সমাজে ভূমির মালিকানা, সার-কীটনাশকের ডিলারশিপ, সেচ ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণ এবং শ্রমশক্তি সরবরাহের সক্ষমতা ইত্যাদি ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির পূর্বশর্ত। আধুনিক নগর জীবনেও শিল্প-মালিকানা, নগদ অর্থের প্রাচুর্য, শ্রমিক সংগঠনের সাথে সংশ্লিষ্টতা ইত্যাদি ক্ষমতা কাঠামোয় প্রভাব বিস্তার করে।

৬) নিরাপদ জীবনের অবলম্বনঃ নিরাপদ জীবনের জন্য চাই অর্থ এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা নিশ্চিত করা না গেলে নিরাপদ জীবন অর্থহীন। উল্লিখিত প্রতিটি বিষয়ই মানুষের নিরাপদ জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট। এসবের প্রতিটি ক্ষেত্রেই রয়েছে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংশ্লিষ্টতা। বস্তুত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ব্যতীত মানুষের জীবন অকল্পনীয়। আদিম হতে আজ পর্যন্ত কোনো না কোনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই মানুষ নিরাপদ জীবন-যাপনের স্বাদ গ্রহণ করছে।

৭) **সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাবশালী উপাদানঃ** কার্ল মার্কসের মতে, সমাজের মৌল কাঠামো (অর্থনীতি) উপরি কাঠামোকে (রাষ্ট্র, সমাজ, সংস্কৃতি ইত্যাদি) প্রভাবিত করে। বস্তুত সামাজিক পরিবর্তনে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভূমিকা অপরিসীম। কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দাস ও সামন্ত সমাজের পৃষ্ঠপোষক। শিল্পভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নগর সমাজের গোড়াপত্তন করে। সেবাখাতের বিকাশে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মুদ্রা বিনিময় ও প্রযুক্তির ব্যবহার অধিকতর শক্তিশালী হয়। ফলে সামাজিক সম্পর্ক, পেশা, শ্রেণি ও ক্ষমতা কাঠামোতে নানা পরিবর্তন সাধিত হয়। সুতরাং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সামাজিক পরিবর্তনের নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করে।

৮) **আধুনিকায়ন ও নগরায়নকে ত্বরান্বিত করেঃ** অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই আধুনিকায়ন ও নগরায়নের সূচনা হয়েছিল। শিল্প ও সেবা নির্ভর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উৎকর্ষ আধুনিকায়ন ও নগরায়নকে সমৃদ্ধ করেছে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা শক্তিশালী হলে মানুষের চাহিদা, রুচি, মূল্যবোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসে। সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও নানা মাত্রা ও জটিলতা পরিলক্ষিত হয়। এগুলো আধুনিক ও নগরায়িত সমাজের বৈশিষ্ট্য বলে পরিগণিত। সুতরাং পরিবর্তিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই আধুনিকায়ন ও নগরায়নকে অনিবার্য করে তোলে।

৯) **শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক অগ্রযাত্রার সহায়কঃ** অর্থনৈতিক ব্যবস্থা শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক অগ্রযাত্রার পূর্বশর্ত। মানুষ যখন শিকার ও খাদ্য সংগ্রহভিত্তিক জীবন-যাপন করত তখন মূলত কোনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই ছিল না। ফলে সেখানে শিক্ষা ও বিজ্ঞান চর্চার চিন্তাও মানুষের মধ্যে বিকশিত হয়নি। কিন্তু কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিকাশের ফলে মানুষ ক্রমশ শিক্ষা ও বিজ্ঞান চর্চায় মনোনিবেশ করে। শিল্প ও পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক অগ্রযাত্রাকে অনেক বেশি গতিশীল করেছে। বস্তুত শিক্ষা ও বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার সাথে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিকাশের নিবিড় সম্পর্ক অনস্বীকার্য।

১০) শোষণ-বঞ্চনা ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের জন্ম দেয়ঃ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সমাজে অসমতার জন্ম দেয়। ফলে শ্রেণিভিত্তিক সমাজে শোষণ-বঞ্চনা এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাত পরিলক্ষিত হয়। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অনিবার্য নিয়মে সমাজে মালিক শ্রেণি ও শ্রমজীবী শ্রেণির উদ্ভব হয়। মালিক শ্রেণির মুনাফা লাভের প্রবণতা থেকে শ্রমজীবীদের উপর শোষণ ও বঞ্চনা হয়। শোষণ থেকে সচেতনতা, সচেতনতা থেকে সংগ্রাম এমনকি দ্বন্দ্ব-সংঘাত। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণিরও জন্ম দেয়।

সমাজে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত শ্রেণির মূলেও রয়েছে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। সুতরাং শ্রেণিভিত্তিক সমাজ, শ্রেণি-শোষণ এবং বিভিন্ন শ্রেণির পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত মূলত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অনিবার্য ফল।

শিক্ষার্থীর কাজ	সমাজে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গুরুত্ব লিখুন।	**সময় : ১০ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলতে মূলত উৎপাদন ব্যবস্থা, ভোগ, বণ্টন তথা এগুলোর সাথে সম্পর্কিত অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়। মানুষ তার প্রয়োজন ও অভাব পরিপূরণের জন্য উপযোগ সমৃদ্ধ পণ্যের উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের যে ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে তাই অর্থ ব্যবস্থা (Economic system)। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নির্দিষ্ট স্থানে থেমে থাকে না। মানুষ সর্বদা নতুন নতুন ব্যবস্থা উদ্ভাবনে সচেষ্ট থাকে। তাই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও বিবর্তিত হয়ে উন্নতি লাভ করেছে। জীবিকার উৎস, সভ্যতার বিকাশ, সামাজিক স্তরবিন্যাস, শ্রেণি ও ক্ষমতা কাঠামো নির্ধারণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম।

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগ ব্যবস্থার সমন্বয়ে গড়ে উঠে-
(ক) অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (খ) সামাজিক ব্যবস্থা
(গ) রাজনৈতিক ব্যবস্থা (ঘ) বাজার ব্যবস্থা

২। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিচের কোনোটিকে প্রভাবিত করে?
(ক) জীববৈচিত্র্য (খ) সামাজিক স্তর বিন্যাস
(গ) শ্রেণি ও ক্ষমতা কাঠামো (ঘ) 'খ' এবং 'গ' উভয়।

৩। কার্ল মার্কস 'মৌল কাঠামো' বলে অভিহিত করেছেন-
(ক) সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাকে (খ) অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে
(গ) বিচার ব্যবস্থাকে (ঘ) ধর্মীয় ব্যবস্থাকে

পাঠ-১০.২ সম্পত্তি
Property

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সম্পত্তির সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন;
- সম্পত্তির মালিকানার ধরন ও মালিকানা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;

মুখ্য শব্দ	সম্পত্তি, সম্পত্তির ধরন, মালিকানা ইত্যাদি।

মৌলিক ধারণা (Basic Concept)

সাধারণ অর্থে সম্পত্তি হচ্ছে কোনো বস্তু বা সম্পদের উপর ব্যক্তির সমাজস্বীকৃত চূড়ান্ত অধিকার বা মালিকানা। অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও উপযোগ সম্বলিত মালিকানাধীন কোনো বস্তুকে সম্পত্তি বলা যেতে পারে। অধিকার (Right) ছাড়া সম্পত্তির অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায় না। সম্পদ এবং সম্পত্তির পার্থক্য গড়ে উঠে অধিকার বা মালিকানার ভিত্তিতে। প্রাকৃতিক সম্পদে সবার অধিকার থাকে, কিন্তু সামষ্টিক অধিকারে এর মূল্য প্রকাশ পায় না। যখন সুনির্দিষ্ট অধিকার বা মালিকানা আরোপিত হয় তখনই তার মূল্য বেড়ে যায়। সাধারণত মানুষ সম্পদের উপর সময়, শ্রম, মূলধন, প্রযুক্তি সর্বোপরি অধিকার আরোপের মধ্য দিয়ে মালিকানা অর্জন করে এবং সম্পত্তি হিসেবে তখন এর গুরুত্ব আরও অনেক বেড়ে যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বঙ্গোপসাগরে জেগে ওঠা কোনো চর হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদ। এ চর যদি বাংলাদেশের অধিকার বা মালিকানায় অন্তর্ভুক্ত হয় তখন এটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। কারণ মালিকানার কারণে এটি বাংলাদেশের সম্পত্তি বলে পরিগণিত। ভারত-মায়ানমার ইচ্ছা করলেও এটি তাদের অধিকারে নিতে পারে না।

সম্পত্তির সংজ্ঞা (Definition of property)

বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদ বিভিন্নভাবে সম্পত্তির সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যেমন: K. Davis তাঁর '*Human Society*' (1948: 452) গ্রন্থে বলেছেন, "সম্পত্তি সীমাবদ্ধ কোনো কিছুতে মানুষের অধিকার এবং আইনগত বৈধতা ব্যতীত আর কিছুই নয়।" (Property is nothing more than rights and obligations with respect to something scarce.) সম্পত্তির সংজ্ঞায়, '*International Encyclopedia of social sciences*' (Vol. 12. P. 590)'-এ বলা হয়েছে, "সম্পত্তি এমন একটি প্রত্যয়ের নাম, যা সীমাবদ্ধ কোনো সামাজিক মূল্যের প্রতি মানুষের অধিকার, আইনগত বৈধতা, ভোগের নিশ্চয়তা এবং নিরাপত্তা যা ঐ সমাজের মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।" (Property is the name for a concept that refers to the rights and obligations and the privileges and restrictions thats govern the behaviour of man in society towards the scarce object of value in that society.)

সম্পত্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা দিয়েছেন L. T. Hobhouse তাঁর '*The Historical Evolution of Property*' গ্রন্থে। তাঁর মতে, "সম্পত্তি এমন একটি প্রত্যয়কে ধারণ করে যা বস্তুর উপর ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ। এ নিয়ন্ত্রণ সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত এবং সম্পত্তি কম-বেশি স্থায়ী ও একচেটিয়া।" (Property is to be conceived in terms of the control of man over things, a control which is recognized by society, more or less permanent and exclusive.)

অতএব, সম্পত্তি হচ্ছে এমন সম্পদ যার উপর ব্যক্তি বা সমাজের নিরঙ্কুশ এবং স্থায়ী মালিকানা ও অধিকার রয়েছে। এ অধিকার বা মালিকানা সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত এবং সংরক্ষিত। সম্পত্তির যোগান সীমাবদ্ধ এবং তা হস্তান্তরযোগ্য।

সম্পত্তির বৈশিষ্ট্য (Characteristic of property)

উপর্যুক্ত সংজ্ঞা ও আলোচনার ভিত্তিতে প্রতীয়মান হয় যে, সম্পত্তির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় মালিকানা এবং অধিকার অপরিহার্য। এটি সম্পত্তির প্রধান বৈশিষ্ট্যও বটে। যেসব বৈশিষ্ট্যের আলোকে সম্পত্তিকে সহজে সনাক্ত করা যায়, পরপৃষ্ঠায় সেগুলো উল্লেখ করা হল:

১। দখলিস্বত্ব (Occupation)**:** সম্পত্তির দখলিস্বত্ব বলতে মূলত কারও অধিকারে থাকা এবং ভোগ করাকে বুঝায়। যে সম্পদের উপর কারও দখল আরোপিত নয়, তা সম্পত্তির আওতাভুক্ত হতে পারে না।

২। চুক্তি (Contract)**:** সম্পত্তি অর্থনীতির কোনো স্থবির সত্তা নয়। এটি বিনিময়, হস্তান্তরিত ও বিবর্তিত হতে পারে। আর চুক্তি এ ক্ষেত্রে একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত। আদি হতে আজ পর্যন্ত সম্পত্তির যে বিবর্তন হয়েছে এবং বিকাশ হয়েছে, তার মূলে রয়েছে চুক্তি।

৩। সম্পত্তির অধিকার (Property right)**:** সম্পত্তির ভিত্তি দান করেছে এর উপর মানুষের অধিকার। সম্পত্তির উপযোগিতা আছে। মানুষের অভাব ও প্রয়োজন মেটানোর ক্ষমতা আছে। তাই এর উপর মানুষের অধিকার অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়। যেমন: পুঁজি, প্রযুক্তি, সময়-শ্রম বিনিয়োগ করে ভূগর্ভস্থ পানি (প্রাকৃতিক সম্পদ) উত্তোলন করার পর তার মানুষের অধিকার আরোপিত হয়। এ অধিকার ও মালিকানার ভিত্তিতে ওই পানির বাণিজ্যিক ব্যবহার হয়ে থাকে।

৪। মুদ্রা (Money)**:** আদিম সম্পত্তিতে মুদ্রা ছিল না। চুক্তি ও বিনিময়ের মাধ্যমে অর্থনৈতিক লেনদেন সম্পন্ন হত। কিন্তু আধুনিক অর্থনীতি তথা সম্পত্তির মূল নিয়ামক হচ্ছে মুদ্রা। মুদ্রা ব্যবস্থাই আধুনিক সম্পত্তির মূল শক্তি।

সমাজবিজ্ঞানীয় K. Davis সম্পত্তির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। যেমন:

ক) হস্তান্তরযোগ্যতা (Transferability)**:** উত্তরাধিকার, বিক্রয়, দান প্রভৃতি প্রয়োজনে সম্পত্তির হস্তান্তরযোগ্যতা অনিবার্য একটি বিষয়। তাই হস্তান্তরযোগ্যতা ছাড়া কোনো কিছুকে সম্পত্তি বলে গণ্য করা যায় না।

খ) শক্তি সত্তা (Power aspects)**:** সম্পত্তির মধ্যে একটি শক্তি বা ক্ষমতা লুকিয়ে থাকে। এ শক্তি বলেই বস্তু সম্পত্তিতে পরিণত হয় এবং মানুষের প্রয়োজন মেটাতে পারে।

গ) সম্পত্তি হচ্ছে কোনো বস্তুগত উপাদান (Concrete external object)**:** ডেভিসের মতে, সম্পত্তি বলতে কোনো না কোনো বস্তুকেই নির্দেশ করে। অবস্তুগত কোনো উপাদান সম্পত্তি নয়। এগুলো ছাড়াও সম্পত্তির ক্ষেত্রে অধিকার বা মালিকানার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি, স্থায়িত্ব, সীমাবদ্ধতা, উপযোগিতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য অনস্বীকার্য।

উল্লেখ্য যে, সম্পত্তি যেমন বস্তুগত হতে পারে, তেমনি অবস্তুগতও হতে পারে। যেমন: মানুষের সুনাম, সততা, মেধা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, সৃজনশীলতা ইত্যাদি অবস্তুত সম্পত্তি।

সম্পত্তির ধরন ও মালিকানা (Types and ownership of property)

ইতোমধ্যে আমরা জানতে পেরেছি অধিকার ও মালিকানা হচ্ছে সম্পত্তির অনিবার্য বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এ মালিকানা সব সময় সব সমাজে এক ও অভিন্ন নয়। যেমন T. B. Bottomore তাঁর '*Sociology*' গ্রন্থে সম্পত্তি তথা এর মালিকানার ধরন দেখিয়েছেন নিম্নরূপভাবে:

১। বেসরকারি সম্পত্তি (Private property)| এটি আবার ২ প্রকার। যথা:
(ক) ব্যক্তিগত (Individual) এবং (খ) গোষ্ঠীগত (Collective)।

২। সমষ্টিগত সম্পত্তি (Common property)।

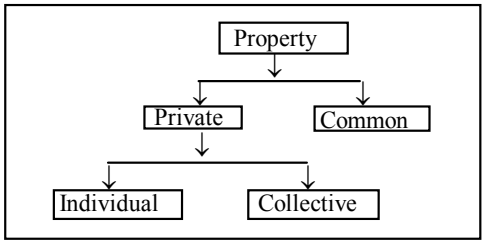

চিত্র : সম্পত্তির ধরন ও মালিকানা

বেসরকারি মালিকানাধীন সম্পত্তি: এ সম্পত্তিতে মালিকানা ব্যবস্থা সংরক্ষিত থাকে। নির্দিষ্ট মালিক ব্যতীত অন্য কেউ এ সম্পত্তি অধিকার বা ভোগ দখল করতে পারে না। এটি সম্পূর্ণ একক বা ব্যক্তিগত হতে পারে। আবার গোষ্ঠীগত বা কয়েকজনেরও হতে পারে। যেমন: দক্ষতা, মন্ত্র-তন্ত্র, ব্যাংকে সংরক্ষিত টাকা, নিজ নামের জমি কিংবা ভবন-বাড়ি ইত্যাদি একক ব্যক্তিগত সম্পত্তি (Individual property)। এজমালি জমি, অংশগ্রহণভিত্তিক ব্যবসা, যৌথ পরিবারের সম্পত্তি,

কোনো গোষ্ঠীর তীর্থস্থান, ধর্মীয় সম্পত্তি কিংবা কোনো কিংবা কোনো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মালিকানাধীন পশুচারণভূমি ইত্যাদি গোষ্ঠীগত সম্পত্তি (Collective property)।

সমষ্টিগত মালিকানাধীন সম্পত্তি (Common property)**:** যে সম্পত্তিতে কোনো গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, শ্রেণি বা জাতির যৌথ মালিকানা স্বীকৃত তা-ই যৌথ সম্পত্তি (Common property)। Bottomore বলেছেন, "Common ownership may be maintained for the joint family." আদিম সমাজে প্রায় সব সম্পত্তি সমষ্টিগত বা সাধারণ মালিকানায় বিদ্যমান ছিল।

আকারগত দিক থেকে সম্পত্তিকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা:

১। স্থাবর বা বস্তুগত সম্পত্তি (Tangible property)**:** জমি (Land), বাড়ি, আসবাবপত্র ইত্যাদি স্থাবর বা বস্তুগত সম্পত্তি। এগুলো একক ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকতে পারে, আবার গোষ্ঠীগত বা সাধারণ মালিকানায়ও থাকতে পারে।

২। অবস্তুগত সম্পত্তি (Intangible property)**:** ধরা-ছোঁয়া যায় না এমন সম্পত্তি হচ্ছে অবস্তুগত সম্পত্তি। এটি মূলত একক ব্যক্তিগত সম্পত্তি। যেমন: সেবা, সুনাম, কাব্যপ্রতিভা ইত্যাদি।

সমাজবিজ্ঞানী নাজমুল করিম তাঁর 'সমাজবিজ্ঞান সমীক্ষণ (১৯৯৩, ৫ম সংস্করণ)' গ্রন্থে বিভিন্ন প্রকারের সম্পত্তির উল্লেখ করেছেন। যেমন:

১। জমি: এটি মানুষের সর্বজনীন সম্পত্তি। আদি হতে আজ পর্যন্ত জমি প্রথম ও প্রধান সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত।
২। অস্থাবর সম্পত্তি: পোশাক-পরিচ্ছদ, গহনা, অস্ত্র, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি হচ্ছে অস্থাবর সম্পত্তি।
৩। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত সম্পত্তি : মন্ত্র-তন্ত্র, নিজের নাম, শিক্ষা, দক্ষতা ইত্যাদি ব্যক্তি মালিকাধীন সম্পত্তি।
৪। দাস: দাস যুগে মানুষের জীবন্ত সম্পত্তি হিসেবে দাস ছিল অত্যন্ত মূল্যবান সম্পত্তি।

নাজমুল করিম সম্পত্তির মালিকানার ক্ষেত্রে ছয়টি প্রকরণের কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলো হচ্ছে:

(১) গোষ্ঠী বা দলগত মালিকানা। (২) পারিবারিক মালিকানা।
(৩) উচ্চবংশের পারিবারিক মালিকানা। (৪) সামন্ত প্রভুর মালিকানা।
(৫) দলপতির মালিকানা। (৬) ব্যক্তিগত মালিকানা।

শিক্ষার্থীর কাজ	একটি ছকের মাধ্যমে সম্পত্তির ধরনগুলো প্রকাশ করুন।	**সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম আলোচ্য বিষয় হল সম্পত্তি ও সম্পত্তির মালিকানা। সম্পত্তি বলতে বোঝায় এমন বিষয় বা বস্তু যার উপর, সমাজ ব্যক্তি মালিকানার স্বীকৃতি প্রদান করে। সম্পত্তির মালিকানাকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যেতে পরে, এর মধ্যে সমষ্টিগত মালিকানা, ব্যক্তিগত মালিকানা ও যৌথ মালিকানাই মুখ্য। আদিম সমাজে সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না, ছিল গোষ্ঠীগত বা যৌথ মালিকানা। ধীরে ধীরে সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোনো সম্পদ সম্পত্তি হতে হলে এর পূর্বশর্ত কী?
(ক) হস্তান্তরযোগ্যতা (খ) মালিকানা (গ) উপযোগিতা (ঘ) স্থায়িত্ব

২। টি.বি বটোমোর প্রধানত কয় ধরনের সম্পত্তির উল্লেখ করেছেন?
(ক) দুই ধরনের (খ) তিন ধরনের (গ) চার ধরনের (ঘ) পাঁচ ধরনের

পাঠ-১০.৩ সম্পত্তির বিবর্তন
Evolution of Property

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সম্পত্তির বিবর্তন ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সম্পত্তির বিবর্তন।

মৌলিক ধারণা (Basic Concept)

প্রাকৃতিক সম্পদের উপর সমষ্টিগত মালিকানা থেকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা বিকশিত হয়েছে। নাজমুল করিম বলেছেন, "Private property is a matter of culture and not of instinct." বস্তুত আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সম্পত্তির বিবর্তন ঘটেছে। উদ্ভব হয়েছে ব্যক্তিগত সম্পত্তির। পশুপালনের মধ্য দিয়েই প্রকৃত অর্থে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা বিকশিত হয়। হবহাউসের মতে, পশুর মালিকানাই ব্যক্তিগত সম্পত্তির বোধকে ভীষণভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে... এর ধারাবাহিকতায় কৃষিজীবী সমাজের অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়।

সম্পত্তির বিবর্তন (Evolution of property)

L. T. Hobhouse তাঁর '*The Historical Evolution of Property*' গ্রন্থে সম্পত্তির বিবর্তন তত্ত্ব তুলে ধরেছেন। তিনি তিনটি স্তরের মাধ্যমে তাঁর তত্ত্ব (Scheme) প্রকাশ করেন। এগুলো হচ্ছে:

ক) সামান্য সামাজিক ব্যবধান, অল্প মাত্রার অসমতা এবং অর্থনৈতিক সম্পদের সাধারণ মালিকানা অথবা কেবল সম্প্রদায় কর্তৃক সংগৃহীত সামগ্রী। (Little social differentiation, little inequality and in which economic resources are owned in common or are strictly collected by the community).

খ) সম্পদ সমাজে ব্যাপক অসমতা বৃদ্ধি করে। ব্যক্তিগত কিংবা সমষ্টিগত মালিকানা ক্রমশ সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে আসে। (Wealth increases great inequalities appear, individual or collective ownership escape from community control).

গ) সচেতনতার মাধ্যমে সমাজের অসমতা দূরীকরণ এবং সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে আনার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। (Conscious attempt made to diminish inequality and to restore community control).

প্রখ্যাত সমাজবাদী চিন্তাবিদ কার্ল মার্কসও (১৮১৮–৮৩) সম্পত্তির বিবর্তনে তিনটি স্তরের উল্লেখ করেছেন। এগুলো হচ্ছে:

প্রথম স্তর: আদিম যুগে মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না। শ্রেণিহীন ও শোষণহীন এ সমাজব্যবস্থায় মানুষ প্রকৃতি হতে ফলমূল সংগ্রহ এবং পশু, মৎস্য ইত্যাদি শিকার করে জীবনধারণ করত। প্রকৃতির সবকিছুতে তাদের সবার সমান অধিকার স্বীকৃত ছিল। মার্কস এ সমাজকে আদিম সাম্যবাদ বলে উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয় স্তর: সম্পত্তির বিবর্তনের এ পর্যায়ে সমাজে শ্রেণিবৈষম্য সৃষ্টি হয়, যার মূলে ছিল ব্যক্তিগত সম্পত্তি। মূলত কৃষিভিত্তিক (Agrarian society) সমাজব্যবস্থায় এটি বিদ্যমান। দাস এবং সামন্ত সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রেই বৈষম্যভিত্তিক সম্পত্তির মালিকানা লক্ষ করা যায়। ব্যক্তিগত মালিকানা এবং শ্রেণি শোষণের জন্য আধুনিক পুঁজিবাদী শিল্প সমাজকেও মার্কস দ্বিতীয় স্তরের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

তৃতীয় স্তর: কার্ল মার্কসের মতে, ইতিহাসের সাধারণ নিয়মেই সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদ নামক শ্রেণিহীন সমাজের উদ্ভব হবে। এ সমাজে ব্যক্তি মালিকানা থাকবে না। যাবতীয় সম্পত্তি থাকবে রাষ্ট্রীয় মালিকানায়। জনগণ তাদের যোগ্যতানুযায়ী কাজ করবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পারিশ্রমিক পাবে।

সম্পত্তির বিবর্তন ব্যাখ্যায় সমাজবিজ্ঞানী P. Vinogradoff তাঁর '*Historical Jurisprudence* (1920)' গ্রন্থে চারটি স্তরের

উল্লেখ করেছেন। এগুলো হচ্ছে:

১. উপজাতি ও সম্প্রদায়ের মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণে সম্পত্তি।
২. সামন্তপ্রথায় রাজস্ব প্রদানের ভিত্তিতে সম্পত্তি।
৩. ব্যক্তিগত মালিকানা/তত্ত্বাবধানে সম্পত্তি।
৪. আধুনিক সমষ্টিবাদী মতবাদের প্রভাবে ব্যক্তিগত মালিকানার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ।

নাজমুল করিম তাঁর 'সমাজবিজ্ঞান সমীক্ষণ' গ্রন্থে সম্পত্তির বিবর্তনকে দেখিয়েছেন চারটি স্তরে। এগুলো হচ্ছে:

১। আদিম সমাজ ও সম্পত্তি: আদিম সমাজে মানুষের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা ছিল না। কেবল ক্ষুধা নিবারণের জন্য প্রকৃতি থেকে খাদ্যোপযোগী পশু-পাখি, মাছ, ফলমূল, শিকার ও সংগ্রহ করত।

২। যাযাবর সমাজ ও সম্পত্তি: চতুর্থ হিম যুগের পরে এ স্তরের সূচনা হয়। এসময় মানুষ পশুপালনে ব্রতী হয়। এখানে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নিজস্ব তত্ত্বাবধানে পালিত পশু ছিল ব্যক্তি মালিকানাধীন। এখান থেকেই ব্যক্তি মালিকানার সূত্রপাত হয়।

৩। কৃষি সমাজ ও সম্পত্তি: যাযাবর বা পশুপালন যুগেই কৃষির উদ্ভব হয়। কৃষির মাধ্যমে মানুষ খাদ্যের অধিকতর নিশ্চয়তা বিধান করে। জীবন-যাপনে আসে স্থায়িত্ব। কৃষিভিত্তিক সমাজ থেকেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে।

৪। শিল্প সমাজ ও সম্পত্তি: অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের ফলে 'মুক্তশ্রম'-এর সূচনা হয়। শিল্প-কলকারখানা প্রতিষ্ঠায় সরকারি বা রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য পরিলক্ষিত হয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তির মাধ্যমে বৃহদায়তন শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময় উৎপাদনে নিয়োজিত সবকিছুই ব্যাপক মাত্রায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে বিবেচিত হয়। পুঁজিবাদের তিনটি স্তরের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিকশিত হয়। এগুলো হচ্ছে:

(ক) বাণিজ্যিক পুঁজিবাদ (Commercial capitalism);
(খ) শিল্পভিত্তিক পুঁজিবাদ (Industrial capitalism) এবং
(গ) লগ্নি পুঁজিবাদ (Finance capitalism)।

সম্পত্তির ধারণা মানুষের সহজাত নয়। তবে প্রতিটি সমাজেই রূপভেদে এর উপস্থিতি রয়েছে। আধুনিক সমাজে সম্পত্তি একটি আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত। সামাজিক স্বীকৃতি, নিরঙ্কুশ অধিকার ও মালিকানা এবং উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও হস্তান্তরের নীতিমালা সম্পত্তিকে প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে। আধুনিক সমাজে ব্যাপক বিস্তৃত এবং নিরঙ্কুশ ব্যক্তি মালিকানায় যে সম্পত্তি আমরা দেখি তা মূলত সমাজ-সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিবর্তনের ফল।

শিক্ষার্থীর কাজ	সম্পত্তির বিবর্তন কিভাবে হয়েছে ১০টি বাক্যের মধ্যে ব্যাখ্যা করুন। **সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

আজকের যে সম্পত্তি আমরা দেখি তা মূলত বিবর্তনের ফসল। আদিম সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না বললেই চলে। উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ক্রমশ ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিকশিত হয়েছে। কৃষি যুগে ভূমি ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পত্তি। শিল্প যুগে ক্ষুদ্র ও বৃহদায়তন যন্ত্রচালিত কলকারখানা, ছোট ও বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, নগদ অর্থ, অবকাঠামো, যানবাহন, দক্ষতা, সেবা ইত্যাদি ব্যক্তিগত মালিকানার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। L. T. Hobhouse সম্পত্তির বিবর্তনে কয়টি স্তরের উল্লেখ করেছেন?
(ক) দু'টি (খ) তিনটি (গ) চারটি (ঘ) পাঁচটি

২। ব্যক্তিগত সম্পত্তির সূচনা হয় কোন্ সমাজে?
(ক) শিকার ও খাদ্য সংগ্রহভিত্তিক সমাজে (খ) পশুপালন সমাজে
(গ) কৃষি সমাজে (ঘ) খ ও গ উভয়

পাঠ-১০.৪ শিক্ষা
Education

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- শিক্ষার ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন;
- শিক্ষার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	শিক্ষা, অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান, আচরণিক পরিবর্তন।

মৌলিক ধারণা (Basic Concept)

মানব সমাজের একটি মৌলিক কার্যপ্রক্রিয়া হল শিক্ষা। শিক্ষার ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Education'। Education শব্দটির উদ্ভব হয়েছে ল্যাটিন শব্দ 'এডুকেয়ার' (educare) থেকে। এডুকেয়ার শব্দের অর্থ হচ্ছে 'বড় করা বা পালন করা' (Bring up)। গ্রিক চিন্তাবিদদের কাছে শিক্ষা হল বিকাশ সাধনের এক সুসংবদ্ধ ও সচেতন পদ্ধতি। গ্রিক পণ্ডিতগণ সার্বিক শিক্ষা বোঝাতে 'পাইডিয়া' (Paideia) কথাটি ব্যবহার করে থাকেন। শিক্ষা বলতে কেবল নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে শিক্ষার্থীর শিখন বা পাঠ গ্রহণ নয়, শিক্ষা হল সাফল্যের সঙ্গে ভবিষ্যতের সম্মুখীন হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীর মাঝে প্রয়োজনীয় অভ্যাস এবং মনোভাব গড়ে তোলা।

শিক্ষার সংজ্ঞা (Definition of education)

সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা হচ্ছে আনুষ্ঠানিক বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও অন্যান্য বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। বিধিসম্মতভাবে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম অনুযায়ী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে পঠন-পাঠন পরিচালিত হয়। ব্যাপক অর্থে শিক্ষা হল এক ধরনের স্বয়ং-শিক্ষা। এ অর্থে শিক্ষা কোনো সংগঠন, পরিবার বা প্রতিষ্ঠানের বিষয় নয়। শিক্ষা সমাজের জীবনধারার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, পরিবেশের এক সামগ্রকি প্রভাব। অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জির (Mackenzie) মতে, ব্যাপক অর্থে শিক্ষা বলতে মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন বা আত্মোপলব্ধিকেই বোঝায়। তিনি বলেছেন , "It (education) means, in this sense, the general process by which personality is developed and by which persons are enabled to realize their relations to one another and the universe in which they live.

ম্যাকেঞ্জি মনে করেন, শিক্ষা হল বিরামহীন প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়া জন্ম থেকে আমৃত্যু অব্যাহত থাকে। এ কারণে বলা হয়, 'যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি'। মানুষের জীবনপথে চলতে চলতে নানা অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এসব অভিজ্ঞতার প্রতিটিই কোনো না কোনো শিক্ষা লাভে সাহায্য করে। এ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো পন্থা-পদ্ধতির প্রয়োজন হয় না। এ কারণে বৃহত্তর অর্থে শিক্ষা হল সমগ্র জীবনের বহুমুখী অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান।

হোয়াইটহেড (Whitehead)- এর মতে, শিক্ষার একমাত্র বিষয় হল সর্বতোভাবে বিকশিত বা প্রকাশিত জীবন। তিনি বলেছেন, "There is only one subject matter of education, and that is life in all its manifestations".

সমাজবিজ্ঞানী সামনার (W. G. Sumner) বলেছেন, বস্তুতপক্ষে শিক্ষা হচ্ছে শিশুর দৃষ্টিভঙ্গি, অনুভূতি এবং সক্রিয়তা বিকাশের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা, যা সে স্বাভাবিকভাবে অর্জন করতে পারত না। (It is actually a continuous effort to impose on the child ways of seeing, feeling and acting which he could not have arrived at spontaneously).

এমিল ডুর্খেইম বলেছেন, জীবন যাপনের প্রস্তুতি হিসেবে পূর্ববর্তী প্রজন্মের চর্চিত ক্রিয়াই হল শিক্ষা। সমাজজীবনের চাহিদা পূরণের জন্য শিক্ষা শিশুর মধ্যে দৈহিক, নৈতিক ও বৌদ্ধিক শক্তিকে জাগ্রত ও বিকশিত করে।

মার্কসীয় দর্শন অনুসারে শিক্ষা হল একটি সচেতন সামাজিক কর্ম। শিক্ষা হচ্ছে মানবিক এবং যৌক্তিক গুণাবলী বিকাশের একটি পদ্ধতি। ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ বিকাশই হল শিক্ষার উদ্দেশ্য। মার্কসবাদীদের মতানুসারে শিক্ষা হল এক ধরনের যৌক্তিক

উৎপাদন পদ্ধতি।

সামাজিকভাবে বসবাস করার জন্য, অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য, সুস্বাস্থ্যের জন্য যেসব কলাকৌশল আয়ত্ত করতে হয় তাই শিক্ষা। সুতরাং শিক্ষা হচ্ছে মানুষের আচরণিক পরিবর্তন। বয়োজ্যেষ্ঠদের ক্রিয়াকলাপ, পুঁথিগত জ্ঞান, অর্জিত অভিজ্ঞতা ইত্যাদি ব্যক্তির আচরণ, বিশ্বাস, মনোভাব, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি ক্ষেত্রে দৃশ্যমান পরিবর্তন সাধন করে। ব্যক্তির এ পরিবর্তনের মূলে রয়েছে শিক্ষা। শিক্ষা শিশুর সামাজিকীকরণের অন্যতম প্রভাবশালী বাহন। শিক্ষার উদ্দেশ্য হল ব্যক্তি-মানুষের সুপ্ত প্রতিভা বা ক্ষমতাসমূহকে প্রকাশিত ও পরিমার্জিত করা।

শিক্ষার বৈশিষ্ট্য (Characteristic of education)

আমরা শিক্ষা বলতে কী বুঝায় তা জানতে পেরেছি। এখন আমরা শিক্ষার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করব। প্রথমে দেখা যাক ব্যাপক অর্থে শিক্ষার কি কি বৈশিষ্ট্য রয়েছে:

(ক) ব্যাপক অর্থে শিক্ষা হল আনুষ্ঠানিক নিয়মবর্জিত জ্ঞান। এ শিক্ষার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো ধারা অনুসরণ করা হয় না।
(খ) বৃহত্তর অর্থে শিক্ষা নির্দিষ্ট কোনো পাঠ্যক্রমের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়।
(গ) এ ধরনের শিক্ষা সচেতনভাবে যেমন হয়, তেমনি অসচেতনভাবেও হতে পারে।
(ঘ) শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হয়। ব্যক্তিত্ব বিকাশেও শিক্ষা ভূমিকা অপরিসীম।

প্রাতিষ্ঠানিক বা সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষার কতকগুলো বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন:

(১) শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে এক ধরনের সম্পর্ক থাকে। এক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষা দেন এবং শিক্ষার্থীরা তা গ্রহণ করে।
(২) এখানে সুনির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম, পঠন-পাঠন, পরীক্ষা-ব্যবস্থা, মূল্যায়ন, সফল শিক্ষার্থীদের স্বীকৃতি প্রদান প্রভৃতি বিদ্যমান।
(৩) এ ধরনের শিক্ষা মানুষ সচেতনভাবে গ্রহণ করে থাকে।
(৪) প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জনে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে।
(৫) জ্ঞান, দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি এ শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ পেশাগত উন্নতি লাভ করে।
(৬) বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসা প্রভৃতি বিদ্যায়তনে এ ধরনের শিক্ষা প্রদান করা হয়। অর্থাৎ শিক্ষার সাথে নানা প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ সম্পর্কযুক্ত থাকে।
(৭) সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এর উদ্দেশ্য হল কোনো বিশেষ বিষয়ে জ্ঞান অর্জন কিংবা কলাকৌশল আয়ত্ত করা।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার যেকোনো তিনটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।	**সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সুনির্দিষ্ট অর্থে শিক্ষা হচ্ছে আনুষ্ঠানিক বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও অন্যান্য বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ব্যাপক অর্থে শিক্ষা হল বিশেষ সংস্কার সাধন। বস্তুত শিক্ষা হচ্ছে মানুষের আচরণিক পরিবর্তন। শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হয়। ব্যক্তিত্ব বিকাশেও শিক্ষা ভূমিকা অপরিসীম। সাধারণ শিক্ষা সহজাতভাবে অর্জিত হলেও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জনে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নিচের কোনোটি শিক্ষা?
(ক) মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবর্তন (খ) মানুষের মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন
(গ) মানুষের আচরণিক পরিবর্তন (ঘ) মানুষের অর্থনৈতিক পরিবর্তন

২। 'শিক্ষা হচ্ছে মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন' কে বলেছেন?
(ক) হোয়াইটহেড (খ) টমাস মুর (গ) এমিল ডুর্খেইম (ঘ) ম্যাকেঞ্জি

পাঠ-১০.৫ শিক্ষার শ্রেণি বিভাগ ও ভূমিকা
Types and Role of Education

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- শিক্ষার শ্রেণি বিভাগ বলতে পারবেন;
- শিক্ষার ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, শিক্ষার ভূমিকা ইত্যাদি।

শিক্ষার শ্রেণিবিভাগ (Classification of Education)

শিক্ষাবিজ্ঞানীগণ শিক্ষাকে প্রধানত তিনভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা–

১. অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা (Informal education);
২. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা (Non-formal education) এবং
৩. আনুষ্ঠানিক শিক্ষা (Formal education) ।

১. অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা: ব্যাপক অর্থে শিক্ষাই হলো অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা। প্রাতিষ্ঠানিক বা পরিকল্পনা মাফিক শিক্ষার বাইরে মানুষ পরিবেশ ও সমাজ থেকে যে শিক্ষা লাভ করে তাকে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা বলে। সমাজের মূল্যবোধ, বিশ্বাস, খাদ্যাভ্যাস, রুচিবোধ, সংস্কৃতি, নিয়মনীতি, বিনোদন ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষ এই শিক্ষা অর্জন করে।

২. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা: আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন এবং বিশেষ শিখন চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে পরিচালিত শিক্ষামূলক কার্যক্রমকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বলা হয়। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন:

ক. এ শিক্ষা ব্যবস্থা নমনীয়। শিক্ষা লাভের সময়, স্থান, বিষয়বস্তু, পদ্ধতি, কৌশল পূর্ব নির্ধারিত হলেও শিক্ষার্থীদের সুবিধা অনুসারে পরিবর্তনের সুযোগ থাকে।
খ. বিশেষ কোনো লক্ষ্য কিংবা যোগ্যতা অর্জনে সহায়তার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত ও পরিচালিত হয়।
গ. জীবনের যে কোনো বয়সে এ শিক্ষা লাভের সুযোগ থাকে। যেমন বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত শিক্ষা।

৩. আনুষ্ঠানিক শিক্ষা: আনুষ্ঠানিক শিক্ষা হচ্ছে কাঠামোগত শিক্ষা। শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট বয়সে এরূপ শিক্ষার্জন শুরু করে এবং ধাপে ধাপে স্বীয় যোগ্যতা প্রমাণ সাপেক্ষে শিক্ষার বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা জীবন শেষ করে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পৃক্ত। বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার কয়েকটি স্তর রয়েছে। যেমন: ক) প্রাথমিক স্তর, খ) মাধ্যমিক স্তর, গ) উচ্চ মাধ্যমিক স্তর, এবং ঘ) উচ্চ শিক্ষা।

শিক্ষার ভূমিকা বা কার্যাবলি (Role or functions of education)

সমাজজীবনে শিক্ষার ভূমিকা বিভিন্ন দিক থেকে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তবে শিক্ষার উদ্দেশ্য বা ভূমিকা প্রসঙ্গে দার্শনিক ও সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে ব্যাপক মতানৈক্য রয়েছে। অনেকের মতে ব্যক্তি-মানুষের মানসিক উন্নতি সাধনই হল শিক্ষার উদ্দেশ্য। গ্রিক দার্শনিক প্লেটো এবংএরিস্টটলের মতে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হল জ্ঞানার্জন। এখানে শিক্ষার ভূমিকা বা কার্যাবলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

১। সু-প্রবৃত্তিসমূহের বিকাশ সাধন: শিক্ষার উদ্দেশ্য হল মানুষের প্রকৃতি প্রদত্ত প্রবণতাগুলোকে বিকশিত করা এবং মানুষের মনে আদর্শ চিন্তা জাগ্রত করা। মানুষের সুপ্ত মানসিক শক্তি বা বুদ্ধিবৃত্তি বিকশিত হয় শিক্ষার মাধ্যমে।

২। ত্রুটিপূর্ণ মনোবৃত্তির সংশোধন: শিক্ষা মানুষের মনোভাব ও আচরণের ত্রুটি দূর করে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে অনেক ভ্রান্ত ধারণা এবং অসামাজিক মনোবৃত্তি বর্তমান থাকে। এগুলোর সংশোধনেও শিক্ষার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

৩। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বাহক: শিশুকে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত করে শিক্ষা। দেশ ও সমাজের অতীত, এর

সঙ্গীত-সাহিত্য, শিল্প-দর্শন, ধর্ম ইত্যাদি জ্ঞান আহরণ করে শিক্ষার মাধ্যমে।

৪। প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের সৃষ্টি: বিদ্যায়তনের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় সুর্নিদিষ্ট পাঠ্যক্রম থাকে। এ পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। মূল্যায়নের মাধ্যমে যারা উচ্চ স্থান অধিকার করে তারাই কৃতিত্বের দাবিদার হয়। এ প্রক্রিয়ায় তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে উঠে।

৫। শিক্ষার পেশাগত ভূমিকা: পেশার ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তিকে জীবিকা অর্জনে সক্ষম করে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা অনেকখানি। শিক্ষা ব্যাক্তিকে নির্দিষ্ট কোনো পেশার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত করে তোলে।

৬। সামাজিকীকরণে শিক্ষার ভূমিকা: শিশুর জন্মের পর থেকে ক্রমশ সমাজের উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার মূলে শিক্ষার ভূমিকা সর্বাধিক। সামাজিক আচার-আচরণ, বিশ্বাস, মূল্যবোধ যেমন সমাজ থেকে অর্জিত হয়, তেমনি বিশেষ জ্ঞান, ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক দক্ষতা ইত্যাদি অর্জনে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ভূমিকা রাখে।

৭। রাজনৈতিক সচেতনতা তৈরি: শিক্ষা সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলে। রাষ্ট্র পরিচালনা, আইন প্রণয়ন, নীতি নির্ধারণ, প্রতিনিধি নির্বাচন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সচেতনতা তৈরির মূলে শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গই জনমত তৈরিতে ভূমিকা রাখে।

৮। স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে ভূমিকা: সমাজের যোগ্যতম ব্যক্তিবর্গকে বাছাই করার ব্যাপারে শিক্ষা সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। ফলে অধিকতর যোগ্য ব্যক্তিবর্গ সমাজে বিশেষ মর্যাদায় আসীন হন। শিক্ষার মাপকাঠিতে অনেকের পদ ও পদমর্যাদা নির্ধারিত হয়। তৈরি হয় সামাজিক অসমতা ও স্তরবিন্যাস।

৯। সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ ও সভ্যতা বিনির্মাণে শিক্ষার ভূমিকা: আজকের সমাজ পরিবর্তনের ফসল। এ পরিবর্তনের মূলে মানুষের শিক্ষালব্ধ জ্ঞান সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। উৎপাদন ব্যবস্থার উৎকর্ষ, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, সভ্যতার অগ্রগতির মূলে কাজ করেছে মানুষের শিক্ষা।

১০। আত্মবিশ্বাস ও বিচার-বিবেচনাবোধ: শিক্ষা মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও বিচার-বিবেচনার ক্ষমতা জাগ্রত করে। সমাজজীবনে মানুষের ব্যক্তিত্ব, আত্মমর্যাদাবোধ, ভালো-মন্দের পার্থক্য উপলব্ধির ক্ষমতা নির্ধারণ করে শিক্ষা।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার ধরনগুলো লিখুন।	**সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

শিক্ষাকে কয়েকটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা যায়। উপ-আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক এবং আনুষ্ঠানিক। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরও রয়েছে। যেমন: ১. প্রাথমিক স্তর, ২. মাধ্যমিক স্তর, ৩. উচ্চ মাধ্যমিক স্তর, এবং ৪. উচ্চ শিক্ষা। সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম। মানুষের সুপ্রবৃত্তির উৎকর্ষ এবং কুপ্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ, জ্ঞানের বিকাশ, পেশাগত দক্ষতা, সামাজিকীকরণ, আত্মবিশ্বাস জাগ্রত ইত্যাদি ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। শিক্ষা প্রধানত কয় প্রকার?

(ক) দুই প্রকার (খ) তিন প্রকার

(গ) চার প্রকার (ঘ) পাঁচ প্রকার

২। 'শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হল জ্ঞানার্জন' কে/কারা বলেছেন?

(ক) অগাস্ট কোঁৎ (খ) ম্যাক্স ওয়েবার

(গ) মার্কস-লেনিন (ঘ) প্লেটো-এ্যারিস্টোটল

পাঠ-১০.৬ শিক্ষা মতবাদ
Education Theory

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- শিক্ষা মতবাদ সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন;
- শিক্ষা বিষয়ে বিভিন্ন মনিষীর মতবাদ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	শিক্ষা মতবাদ

মৌলিক ধারণা (Basic Concept)

শিক্ষা একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত মানুষ কোনো না কোনোভাবে শিক্ষা গ্রহণ করে। মানুষের সামাজীকীকরণেও শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম। সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির বিকাশেও শিক্ষার বিকল্প নেই। নানামুখী গুরুত্বের কারণে মনীষীরা শিক্ষা নিয়ে ব্যাপক অনুসন্ধান ও গবেষণা করেছেন। তাঁদের দেয়া মতবাদ শিক্ষা ব্যবস্থাকে অধিকতর কার্যকর, গণমুখী, উন্নত এবং আধুনিক করেছে। এই পাঠে শিক্ষা সম্পর্কে কার্ল মার্কস, কার্ল মেনহেইম এবং এমিল ডুর্খেইমের মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

শিক্ষা মতবাদ কী (What is education theory)

তত্ত্ব বা মতবাদ হচ্ছে কোনোকিছু সম্পর্কে সাধারণ কোনো সূত্র। সমাজবিজ্ঞানে মতবাদ হচ্ছে সমাজ সম্পর্কে সাধারণ কোনো সূত্র বা সিদ্ধান্ত যা কোনো সামাজিক ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্কে ব্যাখা প্রদান করে। মতবাদ বা তত্ত্বে সুনির্দিষ্ট প্রত্যয় এবং পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত অনুমান সন্নিবেশিত থাকে। এখানে বাস্তব তথ্যের সাথে সৃষ্টিশীল চিন্তার প্রয়োগ করা হয়। মতবাদ কখনো সত্যের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। মতবাদের মাধ্যমে সাধারণীকরণের প্রয়াস থাকে।

শিক্ষা মতবাদ হচ্ছে এমন মতবাদ বা তত্ত্ব যা শিক্ষা প্রত্যয়কে ধারণ করে প্রবর্তিত। অর্থাৎ শিক্ষা গ্রহণের উপায়, শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া (Teaching-Learning process), শিক্ষার প্রভাব ও কার্যকারিতা ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে মনীষীরা যেসব মতবাদ দিয়েছেন তাকে শিক্ষা মতবাদ বলে। শিক্ষা সম্পর্কে এমিল ডুর্খেইম, কার্ল মার্কস এবং কার্ল মেনহেইমের মতবাদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এমিল ডুর্খেইমের শিক্ষা মতবাদঃ ডুর্খেইমের মতে, জীবন যাপনের প্রস্তুতি হিসেবে পূর্ববর্তী প্রজন্মের চর্চিত ক্রিয়াই হল শিক্ষা। অর্থাৎ বয়োজ্যেষ্ঠদের জ্ঞান, ধারণা, অভিজ্ঞতা শিশুদের উপর প্রয়োগের কৌশল হচ্ছে শিক্ষা। সমাজজীবনের চাহিদা পূরণের জন্য শিক্ষা শিশুর মধ্যে দৈহিক, নৈতিক ও বৌদ্ধিক শক্তিকে জাগ্রত ও বিকশিত করে। তাঁর মতে, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা (Schooling) নতুন প্রজন্মের সুশৃঙ্খল সামাজিকীকরণের গুরুত্বপূর্ণ বাহন। ডুর্খেইম তাঁর *Moral Education (1906)* এ সমাজে শিক্ষার ভূমিকা তুলে ধরেছেন। তিনি মনে করেন, যেকোনো ধরনের শিক্ষা শিশুদের প্রত্যক্ষণ, অনুভূতি এবং কর্মক্ষমতা অর্জনে বাধ্য করার একটি চলমান প্রচেষ্টা। আর এটি কেউ খুব সহজেই অর্জন করতে পারে না।

ডুর্খেইম শিক্ষা বিজ্ঞানের সাথে শিক্ষকতার কৌশল বা শিক্ষা চর্চার পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে, পদ্ধতিগত এবং বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন ব্যতীত শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জিত হওয়া সম্ভব নয়। তিনি শিক্ষা ক্ষেত্রে নৈতিক শিক্ষার উপরও সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। এজন্য 'ভবিষ্যৎ-শিক্ষক'দেরকে নৈতিক শিক্ষা অর্জন ও প্রদানের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। এজন্য তিনি সমাজে পূর্বনির্ধারিত আচরণবিধি মেনে চলা, সবার সাধারণ স্বার্থে কাজ করা এবং যতটা সম্ভব আমাদের বিভিন্ন আচরণের কারণ সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ও পূর্ণাঙ্গ সচেতনতার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তাঁর মতে, শিক্ষা বিজ্ঞানে সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাতাত্ত্বিক বিষয়ের সমন্বয় সাধন জরুরি।

কার্ল মার্কসের শিক্ষা মতবাদঃ কার্ল মার্কস ১৮৫৯ সালে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর ধারণা উপস্থাপন করেন। ১৮৬০ সালে তাঁর *On General Education* প্রকাশিত হয়। মার্কসের মতে, সব শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক

হওয়া বাঞ্ছনীয়। মার্কস মনে করেন, শিক্ষা কখনো ব্যক্তিগত বিষয় হতে পারে না। প্রাথমিক শিক্ষাকে তিনি কেবল সরকারিকরণ নয়, জাতীয়করণের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কার্ল মার্কসের মতবাদে শিক্ষাকে সর্বজনীন করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সব শিশুকে শিক্ষাদানের লক্ষ্যে রাষ্ট্রের অব্যাহত প্রচেষ্টার উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেছেন। নতুন প্রজন্মকে প্রভাবিত করার লক্ষ্যে পুঁজিবাদী সমাজের শিক্ষায় শাসক শ্রেণির আদর্শ প্রতিফলিত হয়। ফলে তাদের ছেলেমেয়েরাই সর্বোচ্চ সুযোগ-সুবিধা পায়। বিদ্যামান শিক্ষা ব্যবস্থায় অসমতা আরো প্রকট আকার ধারণ করে। এক্ষেত্রে মার্কস এবং এঙ্গেলস শিক্ষাকে শাসক শ্রেণির কবল থেকে উদ্ধার করার কথা বলেছেন।

মার্কসের মতে, বিশেষ করে পুঁজিবাদী সমাজে শিক্ষার সাথে কাজের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। শিক্ষা উৎপাদনশীল দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজে শিক্ষার ভূমিকা আরো বেশি বিস্তৃত। এখানে শিক্ষা সমাজের সব মানুষের উন্নয়নের পরিচর্যা করে।

কার্ল মেনহেইমের শিক্ষা মতবাদঃ কার্ল মেনহেইমের কাছে শিক্ষা হচ্ছে জীবন-যাপন প্রণালী এবং চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করার একটি উপায়। একইসাথে একটি জাতির প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক এবং দর্শনগত মূল্যবোধের প্রকাশ হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষার ক্ষেত্রে সময়কে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে হবে। নির্দিষ্ট বয়সের যেসব জটিলতা, সমস্যা বা চাহিদা রয়েছে সেগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা উচিত যাতে সমাজের বিশেষ কোনো প্রজন্মের উৎকর্ষে অবদান রাখতে পারে। মেনহেইম একটি সাধারণ নীতির উপর ভিত্তি করে তাঁর তত্ত্ব প্রদান করেছেন। এটি কোনো মাঠ গবেষণার ফলাফল নয়। তবে শিক্ষা বিষয়ক এ তত্ত্ব মেনহেইমের সমাজতাত্ত্বিক অবদানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

মেনহেইম শিক্ষার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তাঁর মতে, শিক্ষা অবশ্যই পরীক্ষণের জন্য উন্মুক্ত, তথ্য অনুসন্ধানমূলক এবং মূল্যায়নভিত্তিক হতে হবে। তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে সামাজিক শিক্ষার সুস্পষ্ট পার্থক্য নিরূপণ করেছেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা স্কুল-কলেজ থেকে আর সামাজিক শিক্ষা সমাজের প্রভাবে অর্জিত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষা সম্পর্কে এমিল ডুর্খেইম অথবা কার্ল মার্কসের মতবাদ ব্যক্ত করুন। **সময় : ১০ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

শিক্ষা মতবাদের ক্ষেত্রে এমিল ডুর্খেইম, কার্ল মার্কস এবং কার্ল মেনহেইমের মতবাদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ডুর্খেইমের মতে, জীবন যাপনের প্রস্তুতি হিসেবে পূর্ববর্তী প্রজন্মের চর্চিত ক্রিয়াই হল শিক্ষা। অর্থাৎ বয়োজ্যেষ্ঠদের জ্ঞান, ধারণা, অভিজ্ঞতা শিশুদের উপর প্রয়োগের কৌশল হচ্ছে শিক্ষা। মার্কসের মতে, সব শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়া বাঞ্ছনীয়। মার্কস মনে করেন, শিক্ষা কখনো ব্যক্তিগত বিষয় হতে পারে না। প্রাথমিক শিক্ষাকে তিনি কেবল সরকারিকরণ নয়, জাতীয়করণের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কার্ল মেনহেইমের কাছে শিক্ষা হচ্ছে জীবনযাপন প্রণালী এবং চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করার একটি উপায়। একইসাথে একটি জাতির প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক এবং দর্শনগত মূল্যবোধের প্রকাশ হচ্ছে শিক্ষা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। "পূর্ববর্তী প্রজন্মের চর্চিত ক্রিয়াই হল শিক্ষা" উক্তিটি কার?
(ক) রুশো (খ) কার্ল মার্কস (গ) এমিল ডুর্খেইম (ঘ) ম্যাক্স ওয়েবার

২। *On General Education (1860)* কার রচনা?
(ক) ম্যাক্স ওয়েবার (খ) রবার্ট মার্টন (গ) এমিল ডুর্খেইম (ঘ) কার্ল মার্কস

৩। কার্ল মেনহেইমের মতে শিক্ষা হচ্ছে:
(ক) জীবনযাপন প্রণালী এবং চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করার একটি উপায়
(খ) আচরণের পরিবর্তন
(গ) বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ (ঘ) সৃজনশীলতার উৎকর্ষ

পাঠ-১০.৭ ধর্ম
Religion

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- ধর্মের সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- সমাজজীবনে ধর্মের ভূমিকা ব্যাখা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ধর্ম, বিশ্বাস, অতিপ্রাকৃত শক্তি ইত্যাদি।

মৌলিক ধারণা (Basic Concept)

সামাজিক ব্যবস্থার এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ধর্ম। বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের প্রাথমিক স্তরেই মানুষ ধর্মের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। সভ্যতার বিকাশ কিংবা সামাজিক নিয়ন্ত্রণে ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক মূল্যবান উপাদান হিসেবে ধর্ম হাজার বছর টিকে আছে। বস্তুত মানুষের বিশ্বাস, আস্থা ও নির্ভরশীলতার এক চিরন্তন প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ধর্ম। সে কারণেই সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় ধর্ম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয় হিসেবে বিবেচিত।

ধর্মের সংজ্ঞা (Definition of religion)

ধর্মের ইংরেজি প্রতিশব্দ Religion এসেছে Religere শব্দমূল থেকে যার অর্থ বন্ধন বা সংহতি। অন্যদিকে ধর্মের ভিত্তি হচ্ছে বিশ্বাস। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, ধর্ম হচ্ছে এমন একটি প্রত্যয় যা কোনো বিশেষ সত্তায় বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে কিছু মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে রাখে। E.B Tylor তাঁর *Primitive Culture* গ্রন্থে বলেছেন, ধর্ম হচ্ছে অতিপ্রাকৃত কোনো সত্তায় বিশ্বাস স্থাপন করা (Relgion is belief on super natural being).

The Elementary Forms of Religious Life গ্রন্থে Emile Durkheim বলেছেন, ধর্ম হচ্ছে পবিত্র বস্তুর প্রতি বিশ্বাস ও আনুষ্ঠানিকতার সমন্বিত ব্যবস্থা। উল্লিখিত পবিত্র বস্তু ধরা-ছোঁয়ার বাইরে এবং নিষিদ্ধ হিসেবেও বিবেচিত। বিশ্বাস ধর্মীয় আচরণ একটি নীতি সম্প্রদায়ের চার্চের ন্যায় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত যা তাদেরকে সুদৃঢ় বন্ধানে আবদ্ধ করে। (Religion is a unified system of beliefs and practice relative to sacred things that is things set a part and forbidden. Beliefs and practices a church all those who adhere to them.)

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, ধর্মের তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এগুলো হচ্ছে ক) অতিপ্রাকৃত শক্তির উপর বিশ্বাস (Belief), খ) বিশ্বাসের ভিত্তিতে কিছু কাজ বা আচরণ (Practice) এবং গ) কিছু আনুষ্ঠানিকতা (Ritual)। অর্থাৎ মানুষ প্রথমে বিশেষ কোনো শক্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। এ শক্তির সন্তুষ্টির জন্য পূজা, প্রার্থনা, বলিদান, উপবাস, পুণ্যস্থান দর্শন ইত্যাদি চর্চা করে। বিশ্বাস ও কাজের সমন্বয়ে তৈরি হয় কিছু আনুষ্ঠানিকতা। যেমন প্রার্থনার জন্য পবিত্রতা অর্জন, পোশাক-পরিচ্ছদের শালিনতা, নিয়ম-কানুন মেনে চলা ইত্যাদি।

সুতরাং ধর্ম হচ্ছে একটি চেতনাবোধ যা অতিমানবীয় কোনো শক্তির উপর বিশ্বাসের ভিত্তিতে নানা ধরনের কর্মকাণ্ড, আচার-অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়। ধর্মীয় চেতনাবোধ একই ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে গভীর ঐক্য তৈরি করে।

সমাজজীবনে ধর্মের ভূমিকা (Role of religion in society)

সমাজজীবনে ধর্মের ভূমিকা অপরিসীম। মনীষীদের মতে সমাজের গর্ভ থেকে যেমন ধর্মের উদ্ভব হয়েছে, তেমনি সমাজ বিকাশে ধর্মের প্রভাব অনেকখানি। নিচে সমাজজীবনে ধর্মের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

০১) সামাজিক সংহতি সৃষ্টি করে: সামাজিক সংহতি সৃষ্টিতে ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। একই ধর্মের অনুসারীরা নিজেদের মধ্যে সংহতি বোধ করে। অভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি ধর্মবিশ্বাসীদের মধ্যে সংহতি সৃষ্টি করে।

০২) **সাম্প্রদায়িক বিভাজন সৃষ্টি করে:** ধর্মে ঐক্য বা সংহতি শক্তির (Unified force) পাশাপাশি বিভাজন শক্তিও (Devicive force) বিদ্যমান। বিভাজন শক্তির ফলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হতে পারে। এক ধর্মের অনুসারীদের সাথে

অন্য ধর্মের অনুসারীদের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, দাঙ্গা-কলহ লেগে যেতে পারে।

০৩) সামাজিক নিয়ন্ত্রণ: সামাজিক নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বপূর্ণ বাহন হচ্ছে ধর্ম। ধর্ম দু'ভাবে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ করে। প্রথমত ধর্মীয় শিক্ষা তথা সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ প্রদান করে। দ্বিতীয়ত ধর্ম পরকালে শাস্তির ভয় দেখায়। মৃত্যুর পর দোজখে শাস্তির ভয় এবং বেহেস্তে অপার সুখ-শান্তি মানুষকে সৎ পথে জীবন-যাপনে উৎসাহিত করে।

০৪) অর্থনৈতিক ব্যবস্থা: ধর্ম আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। Max Weber এর মতে, প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মের উদারনীতি ইউরোপে পুঁজিবাদ বিকাশে ভূমিকা রখেছে। আবার সনাতন এবং ইসলাম ধর্ম ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনকে তুচ্ছ বলে ধারণা দেয়। ফলে এখানে অর্থনৈতিক উন্নতি ও পুঁজিবাদের বিকাশ ত্বরান্বিত হয়নি।

০৫) বিবাহ এবং যৌন সম্পর্ক: বিবাহ এবং যৌন সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণে ধর্মের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে। বিবাহের নানা রীতিনীতি, পাত্র-পাত্রী নির্বাচন, আনুষ্ঠানিকতা, স্বামী-স্ত্রীর সংখ্যা ইত্যাদি ধর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আদি হতে আজ পর্যন্ত প্রতিটি সমাজে যৌন সম্পর্কের উপর ধর্মের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। 'অজাচার' প্রথা মোতাবেক কার কার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে না তা ধর্ম দ্বারাই নির্ধারিত।

০৬) পরিবার ও দৈনন্দিন জীবন: অনেকে বলেন, ধর্ম হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। পরিবার এবং দৈনন্দিন জীবনের প্রায় সবকিছু ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত, নির্দেশিত। ধর্মভীরু মানুষ তাদের জন্ম, মৃত্যু, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, আনন্দ-উৎসব সবকিছু ধর্মীয় নির্দেশনানুযায়ী সম্পন্ন করতে চেষ্টা করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	সমাজজীবনে ধর্মের ভূমিকা চিহ্নিত করুন।	**সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

ধর্ম হচ্ছে বিশেষ অতিপ্রাকৃত কোনো সত্তায় বিশ্বাস স্থাপন করা। মূলত সৃষ্টিকর্তা ও ব্যক্তির মধ্যে ধ্যান বা আরাধনার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। সমাজতাত্ত্বিক সংজ্ঞায় ধর্ম হচ্ছে বিশ্বাস, প্রতীকী কর্মকাণ্ড এবং উপাসনা করার একটি ব্যবস্থা যা জ্ঞান অপেক্ষা বিশ্বাস দ্বারা অধিকতর নিয়ন্ত্রিত। সমাজজীবনে ধর্মের ভূমিকা অপরিসীম। সমাজের গর্ভ থেকে যেমন ধর্মের উদ্ভব হয়েছে, তেমনি সমাজ বিকাশের ধর্মের প্রভাব অনেকখানি। সামাজিক সংহতি, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, বিবাহ ও যৌন সম্পর্ক র্নিধারণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ধর্মের ভূমিকা অপরিসীম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। Religion শব্দের অর্থ কী?
(ক) বন্ধন বা সংহতি (খ) বিশ্বাস
(গ) সৃষ্টিকর্তা (ঘ) প্রার্থনা

২। ধর্মের ভিত্তি হচ্ছে:
(ক) ভয়/ভীতি (খ) বিশ্বাস
(গ) সৃষ্টিকর্তা (ঘ) প্রার্থনা

৩। নিচের কোনো ক্ষেত্রে ধর্মের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে:
(ক) সামাজিক অসমতা (খ) সামাজিক নিয়ন্ত্রণ
(গ) সামাজিক সংহতি (ঘ) 'খ' এবং 'গ' উভয়

পাঠ-১০.৮ ধর্মের উৎপত্তি
Origin of Religion

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ বর্ণনা করতে পারবেন;

মুখ্য শব্দ	ধর্মের উৎপত্তি, মহাপ্রাণবাদ, বিবর্তনবাদ, সর্বপ্রাণবাদ, বহু ঈশ্বরবাদ, একেশ্বরবাদ।

মৌলিক ধারণা (Basic Concept)

ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন তত্ত্ব প্রদান করেছেন। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি, সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতি যেমন বিবর্তনের মাধ্যমে বিকশিত হয়েছে, তেমনি ধর্মও বিবর্তিত হয়ে ক্রমশ একেশ্বরবাদে উন্নীত হয়েছে। মানুষের জীবন, জীবিকা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ইত্যাদি ধর্মের উৎপত্তিতে ভূমিকা রেখেছে। ম্যারেট মনে করেন, চিন্তা-ভাবনা থেকে নয় বরং মানুষের কর্মকাণ্ড থেকেই ধর্মের উদ্ভব হয়েছে। ফ্রেজারের মতে ধর্মের উৎপত্তির মূলে রয়েছ যাদুবিদ্যা। ধর্মের উৎপত্তি ব্যাখ্যায় এখানে কয়েকজন মনীষীর মতবাদ নিম্নে প্রদান করা হল।

মহাপ্রাণবাদ (Animatism)

ধর্মের উৎপত্তি বিষয়ে ব্রিটিশ নৃবিজ্ঞানী ম্যারেটের (Marret) মহাপ্রাণবাদ বহুল আলোচিত একটি মতবাদ। তিনি তাঁর *The threshold of Religion (1914)* গ্রন্থে এ মতবাদ ব্যাখা করেছেন। ম্যারেটের মতে, মানুষের ধর্মচিন্তার সূচনা হয়েছে মহাপ্রাণবাদের মাধ্যমে। মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রতিনিয়ত নানা প্রতিকূলতার সম্মুখিন হতো। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে প্রতিদিন মানুষের মৃত্যু হতো, তাদেরকে নানা চড়াই-উৎরাই পার হতে হতো। প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণের কোনো কৌশল তখনো মানুষ রপ্ত করতে পারেনি। ফলে প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে পরিত্রাণের কোনো উপায় মানুষের জানা ছিল না। প্রকৃতির নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে মানুষের মধ্যে প্রচণ্ড ভীতি ছিল। যার মাধ্যমে এ ভীতিকর অবস্থা তৈরি হতো তাকে 'মনা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মনা অতিপ্রাকৃত অস্বাভাবিক একটি নৈর্ব্যক্তিক শক্তি (Impersonal power)। এ শক্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন ছিল ধর্মের আদিরূপ। ম্যারেট একে মহাপ্রাণবাদ বলে উল্লেখ করেছেন।

বিবর্তনবাদী মতবাদ (Evolutionary theory)

ধর্মের উৎপত্তি ব্যাখ্যায় নৃবিজ্ঞানী টেইলরের (E.B Tylor) তত্ত্ব বিবর্তনবাদ নামে পরিচিত। টেইলরের মতে, আত্মার ধারণাকে কেন্দ্র করেই ধর্মের উৎপত্তি, বিবর্তন ও বিকাশ ঘটেছে। টেইলরের এ মতবাদ সর্বপ্রাণবাদ বা Animism নামেও পরিচিত। বিবর্তনবাদে বলা হয়েছে তিনটি স্তর অতিক্রম করে ধর্ম প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। এগুলো হচ্ছে:

ক) সর্বপ্রাণবাদ (Animism)
খ) বহু ঈশ্বরবাদ (Polytheism) এবং
গ) একেশ্বরবাদ (Monotheism)।

সর্বপ্রাণবাদ: টেইলরের মতে, মানুষের আত্মা সম্পর্কে ধারণা থেকে ধর্মের সূচনা হয়েছিল। দিনের আলোয় নিজের ছায়া, পানিতে প্রতিচ্ছবি এবং ঘুমালে মানুষ স্বপ্ন দেখে। এসব থেকে তারা আত্মা সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। তারা মনে করত, আত্মা দেহছাড়া হলে মানুষের মৃত্যু হয়। তারা আত্মাকে এক অদৃশ্য শক্তি এবং সবকিছুর নিয়ন্ত্রক বলে মনে করত। তারা পূজা, উপাসনা কিংবা অর্ঘ্য নিবেদনের মাধ্যমে আত্মা বা অদৃশ্য শক্তিকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করত। মৃত আত্মার সন্তুষ্টির জন্য তারা পূর্বপুরুষের পূজা করত।

বহু ঈশ্বরবাদ: বর্বর যুগের শেষ পর্যায়ে বহু ঈশ্বরবাদের প্রচলন ঘটে। বহু ঈশ্বরবাদ হচ্ছে মূলত অসংখ্য দেবদেবীতে বিশ্বাস স্থাপন। প্রকৃতি পূজাও বহু ঈশ্বরবাদের অন্তর্ভুক্ত। সূর্য, বৃক্ষ, বায়ু প্রভৃতি ছাড়াও তারা মৃত্যুদেবতা, যুদ্ধদেবতা, কৃষি ও শিকারের দেবতা, ভাগ্যদেবী প্রমুখের পূজা করত।

একেশ্বরবাদ: ধর্মের পরিপূর্ণ বিকশিত রূপ হচ্ছে একেশ্বরবাদ। জ্ঞান-বুদ্ধি, মেধা, অভিজ্ঞতা থেকে মানুষ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, বিশ্বের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে এক ও অদ্বিতীয় এক মহাপরাক্রমশালী শক্তি। মানুষ তাদের ব্যাখ্যাতীত বিষয়ে একক সৃষ্টিকর্তার ঐশ্বরিক শক্তির কাছে নিজেদেরকে সমর্পন করে। তারা একক সত্তার প্রার্থনা করতে থাকে। এটিই একেশ্বরবাদ। সভ্যতার উৎকর্ষে একেশ্বরবাদ আরো শক্তিশালী হয়েছে, বিস্তৃতি লাভ করেছে।

ক্রিয়াবাদী মতবাদ (Functional theory)

ক্রিয়াবাদীদের মতে, মানুষ তার প্রয়োজনেই ধর্ম সৃষ্টি করেছে। প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং জীবিকার তাগিদে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। নাজমুল করিমের মতে, প্রাচীনকালে কৃষিকাজের সুবিধার জন্য এবং জরা-ব্যাধি ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে মুক্তির জন্য ভগবানের দরকার হয়ে পড়ে। এর সাথে পারলৌকিক বা ঐশ্বরিক প্রেরণার কোনো সম্পর্ক নেই। বৃষ্টির দেবতা, জরা-ব্যাধির দেবতাকে পূজা অর্চনার মাধ্যমে ধর্মের উৎপত্তি হয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থা, ভৌগোলিক পরিবেশ এবং উৎপাদন ব্যবস্থার আলোকে ধর্ম বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে।

সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ (Sociological theory)

ধর্মের উৎপত্তি ব্যাখ্যায় সমাজতাত্ত্বিকদের প্রয়াসও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। অগাস্ট কোঁৎ, কার্ল মার্কস, এমিল ডুর্খেইম প্রমুখ নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। কোঁৎ ধর্মকে মানুষের বিশেষ মানসিক অবস্থা (State of mind) বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি মনে করেন, মানুষের মানসিক অবস্থা পরিবর্তনের সাথে সাথে ধর্মীয় বিশ্বাসেরও পরিবর্তন ঘটে। বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতির সাথে সাথে ধর্মও সুগঠিত, সুশৃঙ্খল, পরিপক্ক এবং উন্নত রূপ লাভ করে। মানুষ যুক্তির আলোকেই বহুঈশ্বরবাদ থেকে একেশ্বরবাদে উন্নীত হয়। কোঁৎ ধর্মের বিবর্তনকে তিনটি স্তরে বিন্যস্ত করেছেন। এগুলো হচ্ছে:

ক) ধর্মতাত্ত্বিক স্তর বা ঈশ্বরবাদ (Theological stage): আদিম বা প্রাথমিক সমাজে মানুষ ধর্মতাত্ত্বিক স্তরে ছিল। যুক্তিহীন মানুষ সবকিছুতে অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রভাব বলে মনে করত। ঈশ্বরবাদের প্রথম পর্যায়ে (Fatishism) মানুষ প্রকৃতির প্রতিটি বস্তু, ঘটনা বা দুর্ঘটনাকেই প্রাণবন্ত বলে মনে করত। দাবানল, বৃষ্টি কিংবা বন্যা হলে তারা এগুলোকে জীবন্ত এবং ক্ষমতাশালী বলে মনে করত। এরপরে মানুষ বস্তু বা ঘটনার পরিবর্তে অতিপ্রাকৃত শক্তি বা দেবদেবীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে (Polytheism)। তারা বিশ্বাস করত, কোনো বস্তু বা ঘটনা নিজে নয়, অসংখ্য দেবদেবী নেপথ্যে থেকে সবকিছু পরিচালনা করছে। অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানচর্চার ফলে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি আরো উৎকর্ষ লাভ করে। তখন তারা মনে করে, বহু দেবদেবী নয়, সবকিছুর মূলে রয়েছে মহাশক্তিধর একজন ঈশ্বর (Monotheism)।

খ) দর্শনতাত্ত্বিক স্তর (Metaphysical stage): আদিম এবং আধুনিক যুগের মধ্যবর্তী সময় (মধ্যযুগে) দর্শনতাত্ত্বিক স্তরের বিকাশ ঘটে। এ সময় মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি আরো শানিত হয়। এ স্তরে তারা অদৃশ্য কাল্পনিক শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করে। এ স্তরে মানুষ সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে চিন্তা করতে শুরু করে।

গ) দৃষ্টবাদী স্তর (Positive stage): আধুনিক মানুষের চিন্তা ও দর্শনকে কোঁৎ দৃষ্টবাদ বলে অভিহত করেছেন। এখানে যুক্তি এবং কার্যকারণ সম্পর্কের আলোকে সবকিছু ব্যাখ্যা করা হয়। ধর্মবিশ্বাস অপেক্ষা বিজ্ঞানের আশীর্বাদ মানুষের পার্থিব জীবনকে অনেক বেশি প্রভাবিত করে। একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী হলেও মানুষ যুক্তিহীন সংস্কার পরিহার করতে সচেষ্ট হয়।

কার্ল মার্কসের মতে, ধর্ম হচ্ছে ক্ষমতাশালীদের শোষণের হাতিয়ার। সমাজে যারা প্রভাবশালী তারাই ধর্মকে নিজের পক্ষে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে। তিনি মনে করেন, ধর্ম কোনো ঐশ্বরিক বিষয় নয়। সমাজজীবনেও ধর্মের প্রভাব সীমিত। ম্যাক্স ওয়েবারের মতে, ধর্ম কোনোকিছুর ফলাফল নয়, বরং ধর্ম নিজেই ফলাফলকে প্রভাবিত করার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সামাজিক পরিবর্তনে তিনি ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উল্লেখ করেছেন।

এমিল ডুর্খেইম ধর্মের উৎপত্তিতে সমাজ জীবনকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে, সমাজই ধর্মের উৎপত্তি স্থল। ধর্মীয় আদর্শ, রীতিনীতি সমাজ-প্রকৃতির প্রতীক। তাঁর মতে, সমাজই ঈশ্বর। মানুষ ঈশ্বরকে যেমন সমীহ করে চলে, তেমনি সমাজকেও সম্মান প্রদর্শন করে। ধর্ম সামাজিক সংহতির অন্যতম উপাদান হিসেবে কাজ করে।

ডুর্খেইম ধর্মের ব্যাখ্যায় পবিত্রতা (Sacred) এবং অপবিত্রতার (Profance) উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। পবিত্রতার ধারণাটি মূলত অপার্থিব বা ঐশ্বরিক বিষয়ের সাথে যুক্ত। মানুষ অতিপ্রাকৃত শক্তি বা ঈশ্বরের কাছে নিজেকে উপস্থাপন বা সমর্পন করার সময় দৈহিক ও মানসিক পবিত্রাকে অপরিহার্য বলেই মনে করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে বিবর্তনবাদী কিংবা সমাজতাত্ত্বিক যেকোনো একটি মতবাদ সংক্ষেপে ব্যাখা করুন। **সময় : ১০ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

ধর্ম সমাজের অন্যতম প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে মনীষীদের মধ্য নানা মতপার্থক্য রয়েছে। এক্ষেত্রে ম্যারেট, ই.বি টেইলর প্রমুখ বিবর্তনবাদের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। এখানে আত্মার ধারণা ধর্মের উৎপত্তিতে ভূমিকা রেখেছে বলে মনে করা হয়। আবার কোনো কোনো সমাজবিজ্ঞানীর মতে, মানুষের জীবন-জীবিকা ও ভৌগোলিক পরিবেশ ধর্মের উৎপত্তিতে বিশেষ ভূমিকা রখেছে। তারা ধর্মের ঐশ্বরিক বিষয়কে অস্বীকার করেছেন। ডুর্খেইম ধর্মের সাথে টোটেমবাদ এবং পবিত্রতা ও অপবিত্রতার সম্পর্ককে যুক্ত করেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। The Elementary Forms of Relgious Life গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
(ক) অগাস্ট কোঁৎ (খ) ই.বি টেইলর
(গ) এমিল ডুর্খেইম (ঘ) স্যামুয়েল কোয়েনিগ

২। অগাস্ট কোঁৎ ধর্মের বিবর্তনকে কয়টি স্তরে বিন্যস্ত করেছেন?
(ক) দু'টি (খ) তিনটি
(গ) চারটি (ঘ) পাঁচটি

৩। সর্বপ্রাণবাদ তত্ত্বের প্রবর্তক কে?
(ক) অগাস্ট কোঁৎ (খ) ম্যারেট
(গ) এমিল ডুর্খেইম (ঘ) ই.বি টেইলর

পাঠ-১০.৯ নৈতিকতা
Morality

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- নৈতিকতার ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন এবং
- সমাজজীবনে নৈতিকতার প্রভাব ব্যাখা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	নৈতিকতা।

মৌলিক ধারণা (Basic Concept)

মানুষের সাথে ইতর প্রাণির পার্থক্য তৈরিতে বুদ্ধিমত্তা এবং নৈতিকতা সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে। মানুষ যা খুশি তা করতে পারে না। কেবল নিজের স্বার্থ রক্ষা, অপরের ক্ষতিসাধন, কাউকে কষ্ট দেয়া এগুলো মানবিক গুণের পরিপন্থী। মানবিক গুণের মূলে কাজ করে মানুষের নীতিবোধ ও আদর্শ। নৈতিক মানদণ্ডে অগ্রগামিতাই মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে। সমাজে যে যত নৈতিকতার চর্চা করে সে তত শ্রদ্ধাভাজন, গ্রহণযোগ্য ও বরেণ্য ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। অপর দিকে অনৈতিক কাজের জন্য সমাজ, রাষ্ট্র, আইন ও ধর্ম তিরস্কার ও নানা শাস্তির ব্যবস্থা করে থাকে। তাই সভ্য সমাজে নৈতিকতার গুরুত্ব অপরিসীম।

নৈতিকতা কী (What is morality)

নৈতিকতার ইংরেজি প্রতিশব্দ "Morality" ল্যাটিন "Moralitas" শব্দ থেকে উদ্ভব হয়েছে যার অর্থ আদব-কায়দা, চরিত্র বা সঠিক আচরণ। Morality-এর সমার্থক শব্দ হিসেবে Ethics প্রত্যয়টিও বহুলব্যবহৃত। নৈতিকতা হচ্ছে লক্ষ্য নির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যক্রম পরিচালনায় সঠিক ও বেঠিকের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা। বস্তুত শুদ্ধ ও ভুলের মধ্যে প্রভেদ তৈরি করতে পারাই নৈতিকতা।

Marc Hauser তার *Moral Minds: How Nature Designed our Universal Sense of Right and Wrong* (2006) গ্রন্থে বলেছেন, To take morality to refer to an actually existing code of conduct put forward by a society results in a denial that there is a universal morality, one that applies to all human beings. অর্থাৎ নৈতিকতা হচ্ছে সমাজ কর্তৃক নির্ধারণকৃত বিদ্যমান কিছু আচরণবিধি যা সব মানুষের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য।

নৈতিকতা সম্পর্কে ডুর্খেইম (১৯৬১:২৪) তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন:

ক) কেউ কিভাবে আচরণ করবে তার শিক্ষা হচ্ছে নৈতিকতা। অর্থাৎ সমাজে পূর্বনির্ধারিত আচরণবিধি মেনে চলা।

খ) নৈতিকতা সম্পন্ন ব্যক্তি কেবল নিজের স্বার্থে নয়, সমাজ ও সাধারণ মানুষের স্বার্থে কাজ করবে। নিজের কোনো কাজের ফলে যেন অপরের ক্ষতি না সে বিষয়ে লক্ষ রাখবে। এবং

গ) মানুষের বিভিন্ন আচরণের কারণ সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ও পূর্ণাঙ্গ ধারণা থাকা নৈতিকতার জন্য অপরিহার্য।

অতএব, নৈতিকতা হচ্ছে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক ও দর্শনগত একটি গুণ যার মাধ্যমে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, শুদ্ধ-ভুলের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা যায়। নৈতিকতা মানুষকে সততা, শুদ্ধতা এবং ন্যায্যতার দীক্ষা দেয়।

সমাজজীবনে নৈতিকতার প্রভাব (Impact of morality in society)

সমাজ ও সভ্যতার উৎকর্ষে নৈতিকতার প্রভাব অপরিসীম। সমাজে নৈতিকতা না থাকলে নৈরাজ্য এবং বিশৃঙ্খলা বাসা বাঁধে। এখানে সমাজে নৈতিকতার প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

০১) **সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে:** নৈতিকতা মানুষকে যাচ্ছেতাই করা থেকে বিরত রাখে। নৈতিকতা না থাকলে মানুষের জীবন, সম্পদ, সম্মান-মর্যাদা সবকিছু বিপন্ন হতে পারে। নৈতিকতার চর্চা হলে অপরাধ প্রবণতা হ্রাস পায়।

০২) **আইনের শাসন বহাল থাকে:** নৈতিকতা মানুষকে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে। 'আইন সবার জন্য সমান'– এ নীতিবাক্য প্রয়োগে নৈতিকতা অপরিহার্য। নৈতিকতা ব্যতীত আইনের শাসন অসম্ভব।

০৩) **মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা:** সব মানুষেরই জন্মগতভাবে কিছু অধিকার রয়েছে। বেঁচে থাকা থেকে শুরু করে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সবই তার অধিকারের মধ্যে পড়ে। অধিকার প্রতিষ্ঠায় নৈতিকতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার বিকল্প নেই।

০৪) **সামাজিক সমতা রক্ষা:** সমাজের অনিবার্য বাস্তবতা হচ্ছে কেউ ধনী, কেউ দরিদ্র; কেউ সবল আবার কেউ দুর্বল। এখানে কেউ শাসক আবার অনেকে শাসিত। কিন্তু সমাজের সমতা ও ভারসাম্য রক্ষায় নৈতিকতা অপরিহার্য।

০৫) **সামাজিক নিয়ন্ত্রণ:** 'মানুষ বিবেকের দাস'। তাই ক্ষুধা লাগলেই কেউ অপরের খাবার কেড়ে খায় না। বিবেক ও নৈতিকতা মানুষের অনেক ইচ্ছার লাগাম টেনে ধরে। নৈতিক শিক্ষার ফলে মানুষ স্বেচ্ছাচারী হতে পারে না।

০৬) **সততার শিক্ষা দেয়:** নৈতিকতা ও সততাকে অনেকে সমার্থক বলে মনে করেন। বস্তুত নৈতিকতাই সততার শিক্ষা দেয়। কী করা উচিত আর কী উচিত নয়, কোনোটি কল্যাণকর আর কোনোটি ক্ষতিকর নৈতিকতার মাধ্যমে এ বোধ তৈরি হয়।

০৭) **কল্যাণমূলক কাজে উৎসাহ যোগায়:** দরিদ্র, অসহায় ও অনগ্রসর মানুষকে সহায়তা করা একটি নাগরিক দায়িত্ব। সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক যেকোনো কাজের মূলে নৈতিকতার প্রভাব সবচেয়ে বেশি।

০৮) **সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল করে তোলে:** নৈতিকতা মানুষকে সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল করে তোলে। নৈতিকতা সম্পন্ন কোনো মানুষ কখনো সমাজবিরোধী কাজে সম্পৃক্ত হতে পারে না।

০৯) **সমাজের অবক্ষয় রোধ করে:** নৈতিকতার অবক্ষয় মানে সমাজের অবক্ষয়। একটি সমাজ কতটা উন্নত ও স্থিতিশীল হবে তা নির্ভর করে ওই সমাজে কতটা নৈতিকতার চর্চা হয় তার উপর। কোনো সমাজ থেকে নৈতিকতা তুলে দিলে সেখানে নিয়ম-শৃঙ্খলা বলে কিছু থাকবে না।

১০) **চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠন করে:** মানুষের চরিত্র এবং ব্যক্তিত্ব গঠনে নৈতিকতার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। কোনো মানুষ সৎ নাকি অসৎ হবে, শান্তশিষ্ট নাকি বদমেজাজি হবে তা অনেকটা সমাজে প্রচলিত নৈতিকতা দ্বারা নির্ধারিত হয়।

নৈতিকতার অবক্ষয় এবং নৈতিক শিক্ষার উপায়

'নৈতিকতার অবক্ষয়' সাম্প্রতিককালের বহুলউচ্চারিত বিষয়। বিশেষ করে তরুণ সমাজের নৈতিক অবক্ষয় সমাজবিজ্ঞানীদের অনুসন্ধানের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি সম্মানের অভাব, বেপরোয়া মনোভাব, বখাটেপনা, মাদকাসক্তি, বিকৃত কিংবা অননুমোদিত যৌনাচার, কিশোর অপরাধ, জঙ্গিবাদ, মৌলবাদ ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে কিশোর-তরুণদের ক্রমবর্ধমানহারে সম্পৃক্ততা নৈতিকতার অবক্ষয়ের স্মারক হিসেবে বিবেচিত হয়। শিশুদের উপর পাশবিক আচরণ, বর্বর নির্যাতন এমনকি অপহরণ, হত্যা কিংবা গুমের মত ঘটনাও আমাদের হৃদয়ে নাড়া দেয়। এসব কর্মকাণ্ড মূলত নৈতিকতার অবক্ষয়ের ফল।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন এবং কিভাবে নৈতিকতার অবক্ষয় ঘটে? প্রথমত, অপসংস্কৃতির প্রভাবে নৈতিকতার অবক্ষয় ঘটে। নিজ দেশ বা সমাজের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি পরিহার করে তথাকথিত আধুনিক সংস্কৃতির নামে অপসংস্কৃতি নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটায়। দ্বিতীয়ত, আধুনিক প্রযুক্তি ও ইলেক্ট্রনিকস গণমাধ্যম আমাদের দেশের তরুণ সমাজের নৈতিকতার অবক্ষয়ে ভূমিকা রাখছে। এসব প্রযুক্তি ও গণমাধ্যমের কল্যাণে বিদেশি তথা অপসংস্কৃতির সন্ত্রাস, যৌনতা ইত্যাদি তরুণদের আকৃষ্ট করে। ফলে এদের অনেকে নানারকম আপত্তিকর ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। তৃতীয়ত, ধর্মীয় এবং নৈতিক শিক্ষার অভাবে অনেকে ক্রমশ অনৈতিকতার দিকে ঝুঁকে পড়ে। পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পাঠ্যপুস্তকে কার্যকরভাবে নৈতিক শিক্ষা প্রদানের অভাবে নতুন প্রজন্মের অনেকে বিপথে চালিত হয়। চতুর্থত, নগর জীবনের একক পরিবারে বাবা-মা দু'জনই প্রায়শ ব্যস্ত থাকেন। সন্তানকে খুব বেশি সময় দিতে পারেন না। একাকিত্ব থেকে তারা একসময় বেপরোয়া হয়ে উঠে। পঞ্চমত, আমাদের দেশে সুস্থ বিনোদনের অভাব রয়েছে। ফলে অনেকে অনৈতিক ও অননুমোদিত বিনোদনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ষষ্ঠত, নৈতিকতার অবক্ষয়ে যেসব অপরাধ সংঘটিত হয় অনেক সময়ই সেগুলোর দৃষ্টান্তমূলত বিচার হয় না।

এখন দেখা যাক নৈতিক শিক্ষা কীভাবে অর্জন করা যায়। প্রথমত নিজ ধর্ম, ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা প্রয়োজন। নিজ সংস্কৃতি নিয়ে যে গর্ব অনুভব করতে পারে সে কখনো অপসংস্কৃতি দ্বারা বিভ্রান্ত হয় না। ধর্মীয় অনুশাসন যে মেনে চলে তার পক্ষে কখনো বিপথগামী হওয়া সহজ নয়। দ্বিতীয়ত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় নৈতিকতার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা প্রয়োজন। প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষার প্রতিটি স্তরে নৈতিক শিক্ষাকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। তৃতীয়ত পারিবারিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করা জরুরি। সন্তানদের পর্যাপ্ত সময় এবং আদর-স্নেহ দিতে হবে। সন্তান বা ছোট ভাই-বোন বা পরিবারের সদস্যরা কে কোথায় যাচ্ছে, কী করছে, কার সাথে মিশছে, কিভাবে টাকা খরচ করছে সব বিষয়ে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। ভুল-ত্রুটি বা অপরাধ করলে কাউন্সেলিং- এর পাশাপাশি পরিমিত শাসনও থাকা উচিত। চতুর্থত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (মোবাইল, ইন্টারনেট, ফেসবুক, ইউটিউব ইত্যাদি) ব্যবহার এবং বিদেশি টিভি চ্যানেল দেখার বিষয়ে অভিভাবকদের সচেতন থাকতে হবে। পঞ্চমত সুস্থ বিনোদনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা হলে অনৈতিক বিনোদনের চাহিদা এবং আগ্রহ কমে যাবে। প্রচুর পরিমাণে খেলাধুলা, দেশীয় সংস্কৃতির চর্চা ইত্যাদি মানুষকে বিপথগামিতা থেকে ফেরাতে পারে। ষষ্ঠত আইনের কার্যকর প্রয়োগের মাধ্যমে অপরাধী ও অনৈতিকতার চর্চা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	সমাজজীবনে নৈতিকতার প্রভাব বর্ণনা করুন।	**সময় : ১০ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা এবং সংহতির জন্যও নৈতিকতার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু নানা কারণে সমাজে নৈতিকতার অবক্ষয় ঘটে থাকে। বিশেষ করে তরুণ সমাজে নৈতিকতার অবক্ষয় এখন সামাজিক সমস্যা হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। এর থেকে উত্তরণের জন্য নৈতিক শিক্ষা, নিজস্ব সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের চর্চা অপরিহার্য। সুদৃঢ় পারিবারিক বন্ধন, সন্তান এবং ছোট ভাই-বোনদের প্রতি নিবিড় স্নেহ-ভালোবাসা, তাদেরকে সময় দেয়া এবং সুস্থ বিনোদন, খেলাধুলা, বিতর্ক ইত্যাদি তরুণদের বিপথগামিতা রোধ করে নৈতিক শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। "Morality" শব্দটি কোনো শব্দ থেকে উদ্ভুত?

(ক) ল্যাটিন শব্দ Morals থেকে (খ) ল্যাটিন শব্দ Moralitas থেকে

(গ) রোমান শব্দ Morali থেকে (ঘ) গ্রিক শব্দ Moralitia থেকে

২। "Morality" শব্দের অর্থ কী?

(ক) আদব-কায়দা (খ) চরিত্র

(গ) সততা (ঘ) সুপথ

৩। নৈতিকতা বিষয়ে এমিল ডুর্খেইম কয়টি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন?

(ক) দু'টি (খ) তিনটি

(গ) চারটি (ঘ) পাঁচটি

পাঠ-১০.১০ রাষ্ট্র
State

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- রাষ্ট্রের সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- রাষ্ট্রের উপাদান ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- রাষ্ট্রের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	রাষ্ট্র, জনসমষ্টি, ভূখণ্ড, সরকার, সার্বভৌমত্ব।

মৌলিক ধারণা (Basic Concept)

আদিম সমাজে মানুষ যখন যূথবদ্ধ সমাজে বসবাস করত তখনও তারা একজন নেতার নেতৃত্বে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হত। স্বাস্থ্য, সক্ষমতা, বয়স, লিঙ্গ, শক্তি ইত্যাদি বিবেচনায় নেতা নির্বাচিত হত। নেতা নির্বাচন, নেতার প্রতি আনুগত্যতা ইত্যাদির মধ্য দিয়েই মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটেছে। মানব সমাজ ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ক্রমশ জটিল রূপ ধারণ করেছে। রাষ্ট্র তেমনই এক জটিল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রের ধারণা, এর উপাদান ও বৈশিষ্ট্য এবং উৎপত্তি সম্পর্কে মনীষীরা নানা মত ব্যক্ত করেছেন।

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা (Definition of state)

রাষ্ট্র যেমন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, তেমনি সামাজিক প্রতিষ্ঠানও। রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হচ্ছে রাষ্ট্র। Gillin and Gillin রাষ্ট্রের দু'টি বিশেষ স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন। "গঠনতন্ত্রের পটভূমিতে রাষ্ট্র, গঠনতন্ত্রে প্রতিফলিত রাষ্ট্র।" রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব প্রথম স্বরূপকে সামনে রেখে রাষ্ট্রকে মূল্যায়ন করে। সব দেশের গঠনতন্ত্রই সেদেশের সমাজ, সামাজিক কাঠামো, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ইত্যাদি বিষয়ের পটভূমিতে তৈরি হয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দিয়েছেন অধ্যাপক গার্নার (Garner)। তিনি বলেছেন, রাষ্ট্র কম-বেশি এমন একটি জনসমষ্টি যারা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়িভাবে বসবাস করে, যারা বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত এবং যাদের একটি সংগঠিত সরকার আছে যার প্রতি তারা স্বভাবতই আনুগত্য প্রদর্শন করে। ("State is a community of persons, more or less numerous permanently occupying a definite portion of territory, independent or nearly so of external control and possessing an organized government to which the great body of inhabitants render habitual obedience").

ম্যাক্স ওয়েবারের মতে, রাষ্ট্র হল সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রদানের একটি সংঘ। ম্যাকাইভার ও পেজের মতে, অন্যান্য সংঘের সাথে রাষ্ট্রের পার্থক্য হল শক্তি প্রয়োগের চরম ক্ষমতা একমাত্র রাষ্ট্রেরই কর্তৃত্বাধীন। সরোকিন (P. A. Sorokin) বলেছেন, 'রাষ্ট্র হল তার কর্তৃত্বাধীন জনগণের সকল গোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্ক তত্ত্বাবধান ও চাপ প্রশমনের সংগঠন।'

অতএব, রাষ্ট্র হচ্ছে জনগণকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করার একটি শক্তিধর ও সার্বভৌম সংগঠন। জনগণের সার্বিক কল্যাণ সাধন ও সামাজিক শৃঙ্খলা বিধান হচ্ছে রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কাজ।

রাষ্ট্রের উপাদান ও বৈশিষ্ট্য (Elements and Characteristics of state)

রাষ্ট্রের প্রধানত চারটি উপাদান রয়েছে। যথা:

১। জনসসমষ্টি (Population)**:** জনসসমষ্টি নিয়েই রাষ্ট্র। এ জন্য জনসংখ্যাকে রাষ্ট্রের প্রাথমিক উপাদান বা বৈশিষ্ট্য বলে অভিহিত করা হয়। তবে জনসংখ্যার কোনো সুনির্দিষ্ট পরিমাণ নেই। রাষ্ট্রভেদে জনসংখ্যা কম বা বেশি হতে পারে।

২। নির্দিষ্ট ভূখণ্ড (Territory)**:** রাষ্ট্রের সীমারেখা অবশ্যই ভোগোলিকভাবে নির্ধারিত থাকে। সেজন্য রাষ্ট্রের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো এর নির্দিষ্ট ভূখণ্ড। নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়িভাবে বসবাসকারী জনসংখ্যা রাষ্ট্র গড়ে তোলে।

৩। সরকার (Government)**:** জনসংখ্যাকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় সংগঠিত করা, তাদের কল্যাণ সাধন, দেশের সার্বভৌমত্ব এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি রাষ্ট্রের অপরিহার্য উপাদানের নাম সরকার।

৪। সার্বভৌম ক্ষমতা (Sovereignty)**:** সার্বভৌম ক্ষমতা হচ্ছে নৈর্ব্যক্তিক ও নিরংকুশ ক্ষমতা। এর দ্বারা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করা যায়।

উপর্যুক্ত উপাদানগুলো রাষ্ট্রের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হিসেবেও বিবেচিত। রাষ্ট্রের আরোকিছু বৈশিষ্ট্য নিচে উল্লেখ করা হলো:

ক) রাষ্ট্র একটি সামাজিক সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান। এটি সমাজের অংশ, তবে সমাজ রাষ্ট্রের অংশ নাও হতে পারে। রাষ্ট্রের ভৌগোলিক পরিসীমা আছে, সমাজের ক্ষেত্রে এটি বাধ্যতামূলক নয়।

খ) জনগণের কল্যাণ সাধন এবং তাদেরকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

গ) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ও এর অধিবাসীদের সার্বিক নিরাপত্তার লক্ষ্যে একটি সার্বভৌম সরকার থাকা রাষ্ট্রের জন্য বাঞ্ছনীয়।

ঘ) অন্যান্য সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সংস্থা ও স্বার্থ-গোষ্ঠীর সাথে রাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে।

ঙ) সমাজবিজ্ঞানী নাজমুল করিমের মতে, সহযোগিতা এবং অবদমন (Domination) রাষ্ট্রের প্রধান দু'টি বৈশিষ্ট্য।

চ) রাষ্ট্র বিবর্তন প্রক্রিয়ায় সামাজিক সংগঠনের পরিপক্ব এবং একটি চূড়ান্ত স্তর। মানব সংগঠনের একটি বিশেষ পর্যায়ে এসে রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছে।

রাষ্ট্রের কার্যাবলি (Functions of state)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাষ্ট্রের কার্যাবলিকে প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা:

ক) অত্যাবশ্যকীয় কাজ (Essential functions) এবং

খ) ঐচ্ছিক কাজ (Optional functions)।

ক) রাষ্ট্রের অত্যাবশ্যকীয় কাজ: যেসব কাজ রাষ্ট্রের অস্তিত্বের জন্য খুবই জরুরি সেগুলো হলো রাষ্ট্রের অত্যাবশ্যকীয় কাজ। রাষ্ট্রের অত্যাবশ্যকীয় কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে:

০১) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিধান: রাষ্ট্রের প্রথম কাজ হলো বহিঃশক্তির আক্রমণ কিংবা অহেতুক হস্তক্ষেপ থেকে নিজেকে রক্ষা করা। প্রয়োজনে যুদ্ধ বা সন্ধির পথ বেছে নেওয়া। সামরিক শক্তির পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

০২) নাগরিকের নিরাপত্তা বিধান: রাষ্ট্রের কাজ হলো নাগরিকের আইনগত অধিকার ও কর্তব্য সুনিশ্চিত করা। কর প্রদান, রাষ্ট্রীয় আইন ও বিধি-বিধান মেনে চলতে নাগরিকদের বাধ্য করার প্রাথমিক দায়িত্ব রাষ্ট্রকেই পালন করতে হয়। রাষ্ট্র ও সরকারের প্রতি নাগরিকদের অনুগত রাখার ব্যবস্থা নেওয়া রাষ্ট্রের অন্যতম জরুরি কাজ।

০৩) জনগণের অধিকার রক্ষা: সব নাগরিকের জন্য সমান অধিকার এবং আইনের শাসন নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী দ্বারা যেন অন্য কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী শোষিত, বঞ্চিত বা অত্যাচারিত না হয় সে দিকে লক্ষ রাখা রাষ্ট্রের জরুরি কাজের অংশ। জনগণের মৌলিক ও সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার দায়িত্বও রাষ্ট্রের।

খ) রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক বা গৌণ কাজ: বর্তমানে রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কাজগুলো এতই গুরুত্ব পাচ্ছে যে, রাষ্ট্রের অত্যাবশ্যকীয় কাজ ও ঐচ্ছিক কাজের মাঝে ভেদরেখা টানা খুবই কষ্টকর। রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কাজকে অসমাজতান্ত্রিক (non-socialistic) এবং সমাজতান্ত্রিক (socialistic) নামে বিভক্ত করা হয়। অসমাজতান্ত্রিক কাজগুলো রাষ্ট্রের জন্য অত্যাবশ্যকীয় নয়, কিন্তু খুবই স্বাভাবিক। যেমন: দরিদ্র এবং অক্ষমদের যত্ন নেওয়া, জনহিতকর কাজ, সেনিটেশন, প্রাথমিক শিক্ষা, পরিসংখ্যান গ্রহণ ও গবেষণা-কর্ম সম্পাদন, ডাক বিভাগীয় কাজ, রাস্তাঘাট, সেতু নির্মাণ, খাল খনন ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধাদি প্রদান ইত্যাদি অসমাজতান্ত্রিক কাজ বলে বিবেচিত।

রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক কাজগুলোর মধ্যে রেলপথ, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, গ্যাস, পানি এবং বিদ্যুত প্রভৃতি সেবাধর্মী কাজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া থিয়েটার, বিশ্ববিদ্যালয়, যাদুঘর, চাকরি, পেনশন এবং অন্যান্য এমন সব কাজ যা সমাজ উন্নয়নমূলক এবং যা সমাজের সুযোগ-সুবিধা ও সম্পদের সুষম বন্টনের নিশ্চয়তা দেয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	রাষ্ট্রের উপাদান এবং কার্যাবলির পৃথক দু'টি তালিকা প্রস্তুত করুন।**সময় : ১০ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

রাষ্ট্র হচ্ছে জনগণকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করার একটি শক্তিধর ও সার্বভৌম সংগঠন। জনগণের সার্বিক কল্যাণ সাধন ও সামাজিক শৃঙ্খলাবিধান হচ্ছে রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কাজ। জনগণ, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সরকার ও সার্বভৌমত্ব হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রধান চারটি উপাদান। অত্যাবশ্যক ও ঐচ্ছিক কাজের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র এর স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখে এবং শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার পাশপাশি জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করে।

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। 'গঠনতন্ত্রের পটভূমিতে রাষ্ট্র, গঠনতন্ত্রে প্রতিফলিত রাষ্ট্র'– উক্তিটি কার?

(ক) Gillin and Gillin (খ) MacIver & Page

(গ) Prof. Garner (ঘ) T.B Bottomore

২। 'রাষ্ট্র হল তার কর্তৃত্বাধীন জনগণের সকল গোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্ক তত্ত্বাবধান ও চাপ প্রশমনের সংগঠন'- কে বলেছেন?

(ক) Aristotle (খ) Robert Berstedt

(গ) P. A. Sorokin (ঘ) T.B Bottomore

৩। রাষ্ট্রের উপাদান কয়টি?

(ক) তিনটি (খ) চারটি

(গ) পাঁচটি (ঘ) ছয়টি

৪। রাষ্ট্রের প্রধান দু'টি কাজ কী কী?

(ক) সামারিক ও সামাজিক (খ) রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক

(গ) অত্যাবশ্যকীয় এবং ঐচ্ছিক (ঘ) কল্যাণমূলক ও নিয়ন্ত্রণমূলক

পাঠ-১০.১১ রাষ্ট্রের উৎপত্তি
Origin of State

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ আলোচনা করতে পারবেন।
- রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে ঐশ্বরিক এবং শক্তি প্রয়োগমূলক মতবাদ বর্ণনা করতে পারবেন।
- রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বিবর্তনমূলক মতবাদ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- রাষ্ট্রের বিকাশে ক্রিয়াশীল উপাদানসমূহের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে নৃতাতত্ত্বিক মতবাদ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ, ঐশ্বরিক মতবাদ, শক্তি প্রয়োগমূলক মতবাদ, সামাজিক চুক্তিমূলক মতবাদ, বিবর্তনবাদী মতবাদ ইত্যাদি।

মৌলিক ধারণা (Basic Concept)

আধুনিক সভ্যতায় রাষ্ট্র শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। কিন্তু একটি সময় ছিল যখন রাষ্ট্রের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। বার্নস বলেছেন, মানব ইতিহাসের দশ ভাগের নয় ভাগ সময় কেটেছে রাষ্ট্রবিহীনভাবে। বস্তুত সমাজ বিবর্তনের এক সুসংগঠিত পর্যায়ে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। যেমন:

ক) সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ (Sociological theory)
খ) ঐশ্বরিক মতবাদ (Divine theory)
গ) শক্তি প্রয়োগমূলক মতবাদ (Force theory)
ঘ) সামাজিক চুক্তিমূলক মতবাদ (Social contract theory) এবং
ঙ) বিবর্তনবাদী মতবাদ (Evolutionary theory)
চ) নৃতাত্ত্বিক মতবাদ (Antropological theory)

ক) সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ: সমাজতাত্ত্বিক মতবাদের প্রবর্তকরা মনে করেন, বন্যদশায় মানুষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে যূথবদ্ধ সমাজে বসবাস করত। তাদের মধ্যে নেতৃত্ব বা কর্তৃত্বের কোনো ধারণা ছিল না। বর্বর দশার এক পর্যায়ে মানুষ পরিবার গঠন করে। পরিবারের ক্ষুদ্র পরিসরে সর্বপ্রথম স্থায়ী নেতৃত্বের সূচনা হয়। তাই ম্যাকাইভারসহ অনেকে পরিবার থেকে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে বলে মন্তব্য করেন। বস্তুত অস্থায়ী, অসংগঠিত একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা থেকে বিবর্তন প্রক্রিয়ায় স্থায়ী, সুসংগঠিত এবং কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। ব্যক্তিগত মালিকানা, শ্রমবিভাজন, শ্রেণি, জটিল উৎপাদন ব্যবস্থা, সম্পত্তি, কর্তৃত্বমূলক শাসন ব্যবস্থাকে অপরিহার্য করে তোলে। ফলে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। স্পেন্সার তাঁর '*Principles of Sociology*' গ্রন্থে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে তিনটি স্তরের কথা বলেছেন। যেমন:

১। উপজাতীয় যুগ (Tribal period)**:** তখন জনসমষ্টি ছিল অসংগঠিত এবং কোনো সরকার ছিল না। এ স্তরে কেন্দ্রবিহীন (uncentralized) রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে ব্যান্ড (Band) ও উপজাতীয় সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব প্রচলিত ছিল।

২। সামরিক যুগ (Military period)**:** অভিযান ও বিজয়ের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। পরিণতিতে শক্তিশালী সমরনায়ক ও উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতাসীন রাজাদের প্রতি আনুগত্যতা পরিলক্ষিত হয়।

৩। শিল্পযুগ (Industrial period)**:** সমরবাদকে অপসারণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করে তোলে।

খ) ঐশ্বরিক মতবাদ: এ মতবাদে রাষ্ট্রকে ঈশ্বর সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান বলে বিবেচনা করা হয়। ঈশ্বর রাষ্ট্র সৃষ্টি করে তা পরিচালনার জন্য নিজস্ব প্রতিনিধি নিয়োগ করেন। এ মতবাদে বিশ্বাস করা হয়, রাষ্ট্রের পরিচালক বা রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি এবং তিনি

তাঁর ইচ্ছানুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। সুতরাং রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বসবাসকারী জনগণকে রাজার নির্দেশ মেনে চলতে হবে এবং তাঁর প্রতি অনুগত থাকতে হবে। রাজার অবাধ্য হওয়ার অর্থ ঈশ্বরের অবাধ্য হওয়া। এ মতবাদে রাজা জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নন। কেননা তিনি ঈশ্বরের প্রতিনিধি- জনগণের প্রতিনিধি নন।

গ) শক্তি প্রয়োগমূলক মতবাদঃ এ মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের উৎপত্তির পিছনে শক্তির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। প্রভুত্বের মাধ্যমে সমাজ তথা রাষ্ট্র পরিচালনার ইচ্ছা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিরই অংশ। এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্রবিহীন আদিম সমাজে শক্তি প্রয়োগের কয়েকটি নমুনা হচ্ছেঃ

ক) সবল কর্তৃক দুর্বলের উপর অত্যাচার এবং দুর্বলকে পরাভূত করে অনুগত রাখার প্রয়াস;
খ) গোত্র-প্রধান কর্তৃক নিজ বংশের সকলকে শাসনে রাখার প্রবণতা;
গ) গোত্রপতির নেতৃত্বে এক গোত্র কর্তৃক অন্য গোত্রের উপর প্রভুত্ব কায়েম;
ঘ) আন্তঃউপজাতি যুদ্ধবিগ্রহ এবং বিজিতের উপর বিজয়ীর আধিপত্য।

এ মতবাদের সারকথা হচ্ছে রাষ্ট্রের উৎপত্তির মূলে রয়েছে 'শক্তি'। বল প্রয়োগের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছে।

ঘ) সামাজিক চুক্তিমূলক মতবাদঃ সামাজিক চুক্তিমূলক মতবাদের কয়েকজন সমাজচিন্তাবিদ হচ্ছেন হব্‌স, লক এবং রুশো (Hobbes, Locke and Rousseau)। তাঁদের মতে, রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছে সমাজে বসবাসকারী মানুষের চুক্তির মাধ্যমে। তারা মনে করেন, আদিম যুগে মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে (state of nature) বাস করতো এবং প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হতো। পরে বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রকৃতির রাজ্যে বসবাসকারী মানুষ চুক্তির মাধ্যমে নিজেদের প্রয়োজনেই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। রুশোর সামাজিক চুক্তির রূপরেখা হচ্ছে, "আমরা সবাই আমাদের সমগ্র ক্ষমতা একত্রিত করে 'সাধারণ ইচ্ছা'র চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অধীনে রাখতে অঙ্গীকার করি।" এভাবে তারা সাধারণ ইচ্ছার (General will) অধীনে রাষ্ট্র গঠন করে।

ঙ) বিবর্তনবাদী মতবাদঃ এই তত্ত্বের মূলকথা হলো রাষ্ট্র আকস্মিকভাবে উৎপত্তি লাভ করেনি। বরং সমাজের ক্রমবিকাশের ধারায় বিভিন্ন উপাদানের ক্রিয়াশীল ভূমিকার ফলে মানব সমাজে রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছে। পরিবার ও জ্ঞাতি সম্পর্ক, ধর্ম, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড এবং যুদ্ধ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত ইত্যাদি রাষ্ট্রের উৎপত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। নৃবিজ্ঞানীদের মতে মাতৃপ্রধান পরিবারই আদি পরিবার। পশুপালন সমাজের আবির্ভাবের সাথে পিতৃপ্রধান পরিবারের সূত্রপাত ঘটে। এ সময় সমাজের বয়স্ক পুরুষের হাতে নেতৃত্ব কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। পরিবারে পিতার কর্তৃত্ব ছিল নিরংকুশ। বস্তুত, নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক চেতনা পিতৃপ্রধান পরিবারেই প্রথম লক্ষ করা যায়। জ্ঞাতিসম্পর্ক রাজনৈতিক জীবনের সংহতি বিধানে সহায়ক ছিল। কৌম বা গোষ্ঠী প্রধান গোলযোগ মিটাতে পরিবার প্রধানের ভূমিকাই পালন করতেন এবং অনেক ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি পরিবার ও কৌম প্রধানের দায়িত্ব পালন করতেন। মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার (MacIver) মনে করেন, পরিবার নামক প্রতিষ্ঠান থেকে রাষ্ট্রের উৎপত্তি করেছে।

রাষ্ট্রের উৎপত্তিতে ধর্মের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিভিন্ন গোত্রের নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাস ছিল। গোত্রপতি নিজেই ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করতেন। গোত্রপতির আদেশ-নির্দেশ অমান্য করার অর্থ ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচারণ করা। নেতৃত্বের প্রতি এরূপ আনুগত্য রাষ্ট্র সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছে। এছাড়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, যুদ্ধ-সংঘাত ইত্যাদি রাষ্ট্র গঠনে বিশেষ অবদান রেখেছে।

চ) নৃতাত্ত্বিক মতবাদঃ নৃবিজ্ঞানীদের মতে, রাজনৈতিক চেতনা ও নেতৃত্বের ধারণা থেকে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটে। আদিম যূথবদ্ধ (Horde society) সমাজের প্রাথমিক পর্যায়ে নেতৃত্বের অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু যূথ জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে একসময় প্রয়োজনের তাগিদেই দলপতি বা নেতার আবির্ভাব ঘটে। ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয় রাজনৈতিক চেতনা। রাষ্ট্রের উৎপত্তির মূলে দলপতি ও রাজনৈতিক চেতনার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে নৃবিজ্ঞানী লুইস হেনরি মর্গান, লোঈ, ফ্রীড প্রমুখ নিজ নিজ ধারণা ব্যক্ত করেছেন। মর্গানের মতে, জৈবিক সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সামাজিক সংগঠনগুলোতে পরবর্তীকালে ধাপে ধাপে রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে। লোঈ মনে করেন, সামান্য হলেও আদিম সমাজে রাজনৈতিক চেতনা বিদ্যমান ছিল। ফ্রীডের মতে, সামাজিক সম্পদ বা সুযোগ-সুবিধার অসম অধিকার (unequal access) হচ্ছে রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বশর্ত। সম্পদ এবং সুযোগ-সুবিধায় যাদের বেশি মাত্রায় অধিকার রয়েছে তাদেরকে সে অধিকার রক্ষা করতে হয়। আর এটা করতে হলে তাদের রাষ্ট্রশক্তি বা ক্ষমতার ব্যবহার জরুরি হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে সমাজতাত্ত্বিক কিংবা বিবর্তনবাদী মতবাদ বর্ণনা করুন। **সময় : ১০ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

আধুনিক সমাজের সবচেয়ে শক্তিশালী সংগঠন হচ্ছে রাষ্ট্র। তবে আদিম সমাজের রাষ্ট্র আর আজকের রাষ্ট্র এক ও অভিন্ন নয়। এমনকি আদিম সমাজে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব সম্পর্কেও বিতর্ক রয়েছে। রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কেও মনীষীদের মধ্যে বিস্তর মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তবে অধিকাংশ মনীষী মনে করেন, বিবর্তন প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্র সুসংগঠিত রূপ লাভ করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। 'মানব ইতিহাসের দশ ভাগের নয় ভাগ সময় কেটেছে রাষ্ট্রবিহীনভাবে'– উক্তিটি কার?
(ক) বার্নস- এর (খ) বটোমোর- এর
(গ) গার্নার- এর (ঘ) জিনসবার্গ- এর

২। 'পরিবার নামক প্রতিষ্ঠান থেকে রাষ্ট্রের উৎপত্তি করেছে'- কে বলেছেন?
(ক) Aristotle (খ) Robert Berstedt
(গ) MacIver (ঘ) T.B Bottomore

৩। রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশে স্পেন্সার কয়টি স্তরের কথা বলেছেন?
(ক) তিনটি (খ) চারটি
(গ) পাঁচটি (ঘ) ছয়টি

৪। রাষ্ট্রের উৎপত্তিতে রুশোর সামাজিক চুক্তির মূল ভিত্তি কী?
(ক) সমঝোতা (খ) শক্তি প্রয়োগ
(গ) নেতৃত্ব (ঘ) সাধারণ ইচ্ছা

পাঠ-১০.১২ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব
Power and Authority

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- ক্ষমতা বলতে কী বুঝায় তা ব্যক্ত করতে পারবেন;
- কর্তত্বের সংজ্ঞা বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ক্ষমতা, কর্তৃত্ব।

মৌলিক ধারণা (Basic Concept)

রাজনৈতিক সংগঠনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয় হচ্ছে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব। রাষ্ট্র, সরকার, রাজনৈতিক দল পরিচালনায় কর্তৃত্ব অপরিহার্য। আবার সামাজিক কাঠামোয় 'ক্ষমতা'র বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। ক্ষমতা কার হাতে কেন্দ্রীভূত, ক্ষমতার উপাদান, সামাজিক অসমতা ও স্তরবিন্যাসে ক্ষমতার প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার গুরুত্ব অনেকখানি।

ক্ষমতা কী (What is power)

সাধারণ অর্থে ক্ষমতা হচ্ছে একটি শক্তি (Force)। এর মাধ্যমে অন্যের ইচ্ছা, সিদ্ধান্ত ও মতামতকে প্রভাবিত করে নিজের মতামত, সিদ্ধান্ত বা ইচ্ছাকে অপরের উপর চাপিয়ে দেয়া যায়। এ প্রসঙ্গে কোহেন (Cohen) বলেছেন, "অপরের আচরণকে প্রভাবিত করার সামর্থ্য অথবা অপরের কার্যক্রমকে প্রভাবিত করার প্রভাব অর্জনই ক্ষমতা (Power)।"

কার্ল মার্কস (Karl Marx) ক্ষমতাকে শ্রেণিস্বার্থের ফল হিসেবে বিবেচনা করেছেন। ম্যাক্স ওয়েবারের (Max Weber) মতে, ক্ষমতা হচ্ছে প্রভাব, কর্তৃত্ব ও আইনের সম্মিলিত শক্তি। ওয়েবার প্রভাব বিস্তারের মাধ্যম হিসেবে অর্থের ক্ষমতাকে (Money power) সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। সামাজিক স্তরবিন্যাসের তৃতীয় মাত্রা হিসেবে ওয়েবার রাজনৈতিক দলের (Party) উল্লেখ করেছেন। রাজনৈতিক দল ক্ষমতার (Power) সাথে যুক্ত।

মার্কিন সমাজতাত্ত্বিক রবার্ট ডাল (Robert Dahl) সামাজিক স্তরবিন্যাস ও শ্রেণিবিন্যাসে ক্ষমতাকে (Power) সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। মিলস্ (C. Wright Mills) তাঁর *'The Power Elite'* গ্রন্থে ক্ষমতাকে সামাজিক সম্পর্কের প্রধান প্রত্যয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ ক্ষমতা অর্থনৈতিক অবস্থান থেকেই উৎপন্ন হয়।

পোলান্টজা (Poulantza)-এর মতে, ক্ষমতার ধারণা সামাজিক সম্পর্কের সেই যথাযথ ধরনের সাথে সংশ্লিষ্ট, যা শ্রেণিসংগ্রাম দ্বারা বিশিষ্টতা অর্জন করে। বস্তুত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, শ্রেণি বিভাজন ছাড়াও প্রশাসন, বিচার প্রক্রিয়া, উৎপাদন যন্ত্র ইত্যাদির উপর প্রভাব বিস্তার করার সামর্থ্যই ক্ষমতার মূল কথা। সমাজের সর্বস্তরে, সর্বক্ষেত্রে ক্ষমতা বিরাজমান। রাষ্ট্র, সরকার, রাজনৈতিক দল, প্রতিষ্ঠান, পরিবার, বিদ্যালয়, খেলার মাঠ, ক্লাব, সংঘ, সর্বত্রই প্রভাবশালী ও ক্ষমতাধর ব্যক্তির উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়, যিনি অন্যদের প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রণ করেন।

ক্ষমতা হচ্ছে সমাজের মৌলসত্তা (A fundamental entity of society)। ক্ষমতার মূলে শিক্ষা, দক্ষতা, অর্থ-বিত্ত, ভূমি, প্রশাসনের উপর নিয়ন্ত্রণ, জনপ্রতিনিধিত্ব, শহরের সাথে যোগাযোগ, জ্ঞাতিগোষ্ঠী, বংশমর্যাদা, আভিজাত্য, সামাজিক মর্যাদা, দৈহিক শক্তি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক স্তরবিন্যাস, শ্রেণিবিন্যাস, সামাজিক মর্যাদা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ক্ষমতার প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততা রয়েছে।

কর্তৃত্ব (Authority)

'কর্তৃত্ব' শব্দটি 'ক্ষমতার' (Power) সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। ক্ষমতা থেকেই কর্তৃত্বের উদ্ভব হয়। কোনো নেতা বা নেতৃত্ব (Leadership) যখন তার ক্ষমতা বলে অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে তখন তাকে কর্তৃত্ব বলে। কর্তৃত্বের সাথে ক্ষমতার

পাশাপাশি 'নেতৃত্ব' এবং 'প্রভাব' প্রত্যয় দু'টিও বিশেষভাবে যুক্ত। সুতরাং কর্তৃত্ব হল ক্ষমতা, প্রভাব ও নেতৃত্বের সমন্বিত বহিঃপ্রকাশ।

কর্তৃত্বের সংজ্ঞায় G. D. Mitchell তাঁর *'A Dictionary of Sociology'* (P. 14) গ্রন্থে বলেছেন, "Authority is that form of power which orders or articulates the actions or other actors through commands which are effective because those who are commanded regard the commands as legitimate." অর্থাৎ কর্তৃত্ব হচ্ছে ক্ষমতার একটি বিশেষ রূপ, যা আদেশ এবং শৃঙ্খলার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। আইনগত বৈধতার জন্য জনগণ এটি মেনে নিতে বাধ্য হয়। আইনগত বৈধতা ছাড়া কর্তৃত্বের গ্রহণযোগ্যতা নেই।

কর্তৃত্ব যখন রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে পরিচালিত হয় তখন তাকে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বলে। অর্থাৎ কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তি বা দল যখন জনগণের উপর প্রভাব খাটানোর আইনগত স্বীকৃতি ও অধিকার পায় তখন তাকে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বলে। মোঃ মকসুদুর রহমান (সম্পা:) এর *'রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানে'* (১৯৯১:১৭৯) বলা হয়েছে, "আইনগত ভিত্তিতে রাজনৈতিক ক্ষমতা পেলে তাকে রাজনৈতিক পরিবৃত্তে কর্তৃত্ব বলে।"

রাজনৈতিক কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে বৈধতা, সম্মতি এবং স্বীকৃতি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এখানে অভ্যন্তরীণ স্বীকৃতি ও বৈধতার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও বৈধতা অপরিহার্য। অন্যথায় কর্তৃত্ব অর্থহীন ও ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ে।

কর্তৃত্বের অবিচ্ছেদ্য উপাদান ক্ষমতা (Power)। সমাজের সর্বস্তরে ক্ষমতার অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। এতে বল প্রয়োগ (Force) এবং সামাজিক শৃঙ্খলার (Social order) বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ক্ষমতাসম্পন্ন এবং প্রতিষ্ঠিত আচার ব্যবস্থাকে কর্তৃত্ব বলে। সুস্থ, সুশৃঙ্খল সমাজজীবন বজায় রাখার জন্য কর্তৃত্ব অপরিহার্য। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 'সরকার'কে কর্তৃত্ব বলা হয়। আবার সামাজিক সংঘ, সমিতির কর্মকর্তাদেরকে সামাজিক কর্তৃত্বের পর্যায়ভুক্ত করা যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে সংজ্ঞায়িত করুন।	**সময় : ১০ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

রাজনৈতিক সংগঠনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয় হচ্ছে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব। কেবল রাষ্ট্র, সরকার, রাজনৈতিক দল পরিচালনায় নয়, সামাজিক কাঠামোয় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের র বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। ক্ষমতা হচ্ছে একটি শক্তি, যার মাধ্যমে অন্যের ইচ্ছা, সিদ্ধান্ত ও মতামতকে প্রভাবিত করে নিজের মতামত, সিদ্ধান্ত বা ইচ্ছাকে অপরের উপর চাপিয়ে দেয়া যায়। কর্তৃত্ব প্রত্যয়টি ক্ষমতার সাথে সম্পৃক্ত। ক্ষমতা থেকেই কর্তৃত্বের উদ্ভব হয়। কোনো নেতা বা নেতৃত্ব যখন তার ক্ষমতা বলে অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে তখন তাকে কর্তৃত্ব বলে। কর্তৃত্বের মাধ্যমে নিজ দল, সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও সাধারণ মানুষের উপর ক্ষমতা আরোপ ও প্রভাব বিস্তার করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। "অপরের আচরণ বা কার্যক্রমকে প্রভাবিত করার সামর্থ্যই ক্ষমতা"– কার উক্তি?

(ক) T.B Bottomore (খ) Cohen

(গ) Prof. Garner (ঘ) Gillin and Gillin

২। রাজনৈতিক কর্তৃত্বের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে—

(ক) দলের মধ্যে ক্ষমতা ও প্রভাব (খ) জনগণের উপর ক্ষমতা ও প্রভাব

(গ) 'ক' ও 'খ' উভয়। (ঘ) বিশাল রাজনৈতিক দল

পাঠ-১০.১৩ কর্তৃত্বের ধরন, উপাদান ও প্রভাব
Types, Element and Impact of Authority

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- কর্তৃত্বের ধরন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- কর্তৃত্বের উপাদানসমূহ লিখতে পারবেন; এবং
- সমাজজীবনে কর্তৃত্বের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ঐতিহ্যগত কর্তৃত্ব, সম্মোহনী কর্তৃত্ব, যৌক্তিক-আইনগত কর্তৃত্ব, কর্তৃত্বের প্রভাব।

কর্তৃত্বের ধরন (Types of authority)

প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার তিন ধরনের কর্তৃত্বের উল্লেখ করেছেন। এগুলো হচ্ছে:

১। প্রচলিত বা ঐতিহ্যগত কর্তৃত্ব;
২। সম্মোহনী বা আকর্ষণীয় কর্তৃত্ব এবং
৩। যৌক্তিক-আইনগত কর্তৃত্ব।

১। ঐতিহ্যগত কর্তৃত্ব (Traditional authority)**:** ঐতিহ্যগত কর্তৃত্বের ভিত্তিমূল হচ্ছে অতীত এবং প্রচলিত প্রথা-ঐতিহ্য। এ কর্তৃত্বের অনুসারীরা প্রচলিত ধারণা, বিশ্বাস এবং নিয়মের কারণেই কর্তৃত্বকে মেনে নেয়। ঐতিহ্যগত কর্তৃত্বের উদাহরণ হিসেবে ওয়েবার পিতৃতান্ত্রিকতার উল্লেখ করেছেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্রিটেনের 'রাজতন্ত্র' ঐতিহ্যগত নেতৃত্বের বড় উদাহরণ। ঐতিহ্যগত কর্তৃত্বের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিচে দেয়া হল:

১। পূর্ববর্তী দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সমস্যার সমাধান করা হয়;
২। মৌলিক পরিবর্তনে আগ্রহী নয়;
৩। অতীতের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে;
৪। এর অনুসারীরা প্রথার (Custom) প্রতি বেশি অনুগত;
৫। ঐতিহ্যগত কর্তৃত্ব বংশপরম্পরায় চলে আসে।

২। সম্মোহনী কর্তৃত্ব (Charismatic authority)**:** গ্রিক শব্দ 'Charisma'-এর অর্থ হচ্ছে 'Gift'। সাধারণত মনে করা হয় সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত কতকগুলো ব্যতিক্রমধর্মী গুণাবলির জন্য বিশেষ কোনো ব্যক্তি সম্মোহনী বা ঐন্দ্রজালিক কর্তৃত্বের অধিকারী হয়। সম্মোহনী কর্তৃত্বের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "Charismatic authority is based on some extraordinary quality of the leader or the leader's ideas."

সম্মোহনী বা ঐন্দ্রজালিক কর্তৃত্বে অনুসারীরা নেতার মধ্যে অতিপ্রাকৃত (Supernatural) গুণাবলি আছে এবং নেতাকে একজন অতিমানব (Superman) বলে মনে করে। এ ধরনের কর্তৃত্বে নেতার সম্মোহন শক্তি বিলুপ্ত হলে নেতৃত্বও বিলুপ্ত হতে পারে। আবার নেতার আদর্শ যুগ যুগ ধরে কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ন রাখতে পারে। সম্মোহনী কর্তৃত্বের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে:

১। নেতার সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব ও গুণাবলিই প্রধান;
২। কিছু অনুসারী থাকে, যারা অন্ধভাবে নেতার কর্তৃত্ব মেনে নেয়;
৩। অনেক ক্ষেত্রে এর আইনগত বৈধ্যতা থাকে না এবং এ কর্তৃত্ব যৌক্তিক না ও হতে পারে;
৪। নেতার অনুপস্থিতিতে তার আদর্শ কর্তৃত্বারোপ করতে পারে;
৫। নেতা বা তার আদর্শের সম্মোহনী প্রভাবের স্থায়িত্ব কর্তৃত্বের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে।

৩। যৌক্তিক-আইনগত কর্তৃত্ব (Rational-legal authority)**:** নিয়মকানুনের ভিত্তিতে সৃষ্ট সংগঠনে যে কর্তৃত্ব বিদ্যমান তাকে

যৌক্তিক-আইনগত কর্তৃত্ব বলে। আইন এবং কাঠামোগত আদর্শের বলে কর্তৃত্ব প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যক্তি বা সংগঠনের কর্তৃত্ব প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। ওয়েবারের মতে, শুধু যৌক্তিক ও আইনগত কর্তৃত্বেরই আইনগত ভিত্তি এবং যৌক্তিকতা রয়েছে। যৌক্তিক আইনগত কর্তৃত্বের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিচে উল্লেখ করা হল:

১। সময়ের বাধ্যবাধকতা থাকে। ক্ষমতা/প্রশাসনে কে কত দিন কী দায়িত্ব পালন করবেন তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকে।
২। কর্তৃপক্ষের প্রশাসনিক পদগুলো উচ্চক্রম-নিম্নক্রম অনুসারে বিন্যস্ত থাকে।
৩। যোগ্যতা এবং কাজকেই (পেশা) জীবিকা বলে গণ্য করা হয় এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়।
৪। সবকিছু আনুষ্ঠানিক (Formal) হয়। ইচ্ছামত নিয়োগ-বরখাস্ত করা সম্ভব নয়।
৫। আইন এবং যুক্তি হচ্ছে এর মূলভিত্তি।
৬। নিয়োগের জন্য যোগ্যতাকে প্রাধান্য দেয়া হয়।

কর্তৃত্বের উপাদান (Element of authority)

যেকোনো কর্তৃত্বের মূলে কোনো না কোনো উপাদান কাজ করে। সময় ও অঞ্চলভেদে এসব উপাদানে পরিবর্তন আসতে পারে। যেমন গ্রামীণ সমাজে কর্তৃত্ব অর্জন বা আরোপে একসময় বংশ, জ্ঞাতি-গোষ্ঠী, ভূসম্পত্তির একচ্ছত্র প্রভাব ছিল। কিন্তু এখন সেখানে শিক্ষা, নগদ অর্থ, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সংশ্লিষ্টতার প্রভাব বেশি। বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কর্তৃত্বের উপাদানকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। এগুলো হচ্ছে:

ক) সনাতন উপাদান: সনাতন উপাদানগুলো মূলত ঐতিহ্যবাহী কৃষিভিত্তিক সমাজে যুগযুগ ধরে কর্তৃত্ব নির্ধারণে ভূমিকা রাখছে। এক্ষেত্রে বংশ মর্যাদা, বৃহৎ জ্ঞাতি-গোষ্ঠী, কৃষি জমির মালিকানা কর্তৃত্ব সৃষ্টির সনাতন উপাদান হিসেবে বিবেচিত। আগে গ্রামীণ সমাজে মোড়ল-মাতুব্বর ও ধর্মীয় নেতাদের বিশেষ কর্তৃত্ব ছিল। এখন জনপ্রতিনিধি কিংবা প্রশাসনের প্রভাব বেশি। শিক্ষার বিস্তার, সচেতনতা, গণতান্ত্রিক পরিবেশ, নগরায়ন, শিল্পায়ন, প্রযুক্তির বিকাশ ইত্যাদি কর্তৃত্বের সনাতন উপাদানকে ক্রমশ দুর্বল করে দিয়েছে।

খ) আধুনিক উপাদান: কর্তৃত্ব নির্ধারণে উদ্ভব হয়েছে নতুন নতুন এবং আধুনিক উপাদানের। এক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষা, কৃষি বহির্ভূত পেশা, নগদ অর্থের মালিকানা; সরকার, প্রশাসন ও রাজনৈতিক দলের সাথে সংশ্লিষ্টতা; জনপ্রতিনিধিত্ব, বীজ-সার-কীটনাশকের ডিলারশিপ, সেচযন্ত্রের মালিকানা, কারিগরি জ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর দক্ষতা ইত্যাদি কর্তৃত্বের আধুনিক উপাদান হিসেবে বিবেচিত।

সমাজজীবনে কর্তৃত্বের প্রভাব (Impact of authority on society)

কর্তৃত্ব একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত। সব সমাজেই কর্তৃত্ব আছে এবং সমাজের উপর কর্তৃত্বের প্রভাবও রয়েছে। নিচে কর্তৃত্বের প্রভাবসমূহ আলোচিত হল:

১। সামাজিক শৃঙ্খলা (Social order)**:** সামাজিক শৃঙ্খলার মূলে রয়েছে কর্তৃত্ব। মানুষের উপর কর্তৃত্বারোপ না করলে সমাজে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে, শান্তি বিনষ্ট হবে এবং প্রগতি ব্যাহত হবে।

২। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Social control)**:** সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থার মূলে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা সর্বাধিক। কর্তৃত্ব সামাজিক নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বপূর্ণ বাহন। সমাজে কর্তৃত্ব আছে বলেই মানুষ যাচ্ছেতাই আচরণ প্রদর্শন করতে পারে না।

৩। সামাজিক স্থিতিশীলতা (Social stability)**:** সভ্য সমাজে স্থিতিশীলতা অপরিহার্য। স্থিতিশীলতা অক্ষুণ্ন রাখতে কর্তৃত্বের বিকল্প নেই। সমাজ থেকে কর্তৃত্ব তুলে নিলে সাথে সাথে সমাজে সংঘাত, সংঘর্ষ শুরু হবে।

৪। সামাজিক সংহতি (Social solidarity)**:** মূলত কর্তৃত্ব হচ্ছে একটি ব্যবস্থাপনা। রাষ্ট্র, সরকার, আইন ইত্যাদি উপাদানের সমন্বিত রূপ হচ্ছে কর্তৃত্ব। কর্তৃত্ব এবং এর উপাদানসমূহের প্রভাবে মানুষ সংহতি বোধ করে, ঐক্যবদ্ধ হয়।

৫। সংস্কৃতি, প্রথা ও ঐতিহ্যের বাহক (Agent of culture and heritage)**:** শুধু ঐতিহ্যগত কর্তৃত্ব নয়, যেকোনো কর্তৃত্বই নিজেদের সংস্কৃতি, প্রথা এবং ঐতিহ্যের ধারক-বাহক। কর্তৃত্বের সেবা ও সদিচ্ছায় সংস্কৃতি, প্রথা যুগের পর যুগ টিকে থাকে, ক্রমোন্নতি লাভ করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	কর্তৃত্বের ধরনগুলো এবং সমাজজীবনে কর্তৃত্বের প্রভাব পৃথক দু'টি ছকে লিপিবদ্ধ করুন।

সারসংক্ষেপ

রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয় হচ্ছে কর্তৃত্ব। কর্তৃত্বকে প্রধানত তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা: ক) ঐতিহ্যবাহী কর্তৃত্ব, খ) সম্মোহনী কর্তৃত্ব এবং গ) আইনগত-যৌক্তিক কর্তৃত্ব। আধুনিক গণতান্ত্রিক বিশ্বে আইনগত-যৌক্তিক কর্তৃত্বের চর্চাই বেশি পরিলক্ষিত হয়। কর্তৃত্ব নির্ধারণ ও চর্চায় সনাতন এবং আধুনিক দু'ধরনের উপাদানই ভূমিকা রাখে। তবে সনাত উপাদানের পরিবর্তে আধুনিক উপাদান ক্রমশ প্রভাব বিস্তার করছে। সমাজজীবনের নানা ক্ষেত্রেও কর্তৃত্ব বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ম্যাক্স ওয়েবার কয় ধরনের কর্তৃত্বের উল্লেখ করেছেন?
(ক) দুই ধরনের (খ) তিন ধরনের
(গ) চার ধরনের (ঘ) পাঁচ ধরনের

২। ব্রিটেনের রাজতন্ত্র কী ধরনের কর্তৃত্ব?
(ক) সনাতন (খ) সম্মোহনী
(গ) যৌক্তিক ও আইনগত (ঘ) কোনোটি নয়

৩। কর্তৃত্বের একটি সনাতন উপাদান হচ্ছে:
(ক) শিক্ষা (খ) ভূসম্পত্তি
(গ) রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ততা (ঘ) বংশ মর্যাদা

ইউনিট-১০ এর উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১	ঃ	১। ক	২। ঘ	৩। খ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.২	ঃ	১। খ	২। ক		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৩	ঃ	১। খ	২। ঘ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৪	ঃ	১। গ	২। ঘ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৫	ঃ	১। খ	২। ঘ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৬	ঃ	১। গ	২। ঘ	৩। ক	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৭	ঃ	১। ক	২। খ	৩। ঘ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৮	ঃ	১। গ	২। খ	৩। ঘ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৯	ঃ	১। খ	২। ক	৩। খ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১০	ঃ	১। ক	২। গ	৩। খ	৪। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১১	ঃ	১। ক	২। গ)	৩। ক	৪। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১২	ঃ	১। খ	২। গ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১৩	ঃ	১। খ	২। ক	৩। ঘ	
চূড়ান্ত মূল্যায়ন	ঃ	১। ক	২। গ	৩। ঘ	৪। ক

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

১. আকারগত দিক থেকে সম্পত্তি কয় প্রকার?

ক. দুই প্রকার খ. তিন প্রকার

গ. চার প্রকার ঘ. পাঁচ প্রকার

২. ধর্মের উৎপত্তিতে মহাপপ্রাণবাদের প্রবক্তা কে?

ক. ই.বি টেইলর খ. মর্গান

গ. ম্যারেট ঘ. টি.বি বটোমোর

খ. বহুপদি সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

৩. সম্পত্তির বৈশিষ্ট্য-

i. দলিলস্বত্ব
ii. চুক্তি
iii. সম্পত্তির অধিকার

সঠিক উত্তর কোনটি?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪. রাষ্ট্রের উৎপত্তিতে স্পেন্সার উল্লেখিত স্তর কোনটি?

i. উপজাতীয় যুগ
ii. সামরিক যুগ
iii. আধুনিক যুগ

সঠিক উত্তর কোনটি?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

গ. সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন:

সোমা এবং লোপা একই ক্লাশে পড়ে। ক্লাশের ফাঁকে তারা একদিন তর্কে জড়িয়ে পড়ে। সোমা বলছে, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে। গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব, আত্মরক্ষা ইত্যাদি রাষ্ট্রের উৎপত্তিতে ভূমিকা রেখেছে। তবে রাষ্ট্র গঠনে সামাজিক চুক্তিরও প্রভাব থাকতে পারে। লোপা সোমার কথায় দ্বিমত পোষণ করে। সে বলে, রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে বিবর্তন প্রক্রিয়ায়। এখানে সমাজতাত্ত্বিক মতবাদেরও সত্যতা রয়েছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংগঠন থেকে নেতৃত্ব বিকাশের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র পরিপূর্ণতা অর্জন করেছে।

(ক) সোমা এবং লোপা কী বিষয়ে তর্ক করছিল? ১

(খ) উদ্দীপকে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত কোন কোন মতবাদের উল্লেখ করা হয়েছে? ২

(গ) সামাজিক চুক্তি মতবাদের মূল বক্তব্য লিখুন? ৩

(ঘ) রাষ্ট্রের উৎপত্তিতে আপনি কোন মতবাদকে যথার্থ বলে মনে করেন? কেন?। ৪